অন্তরের ব্যাধিসমূহ
ও
তাদের চিকিৎসা
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ) কতৃক অন্তরের ব্যাধি ও তাদের প্রতিকার সম্পর্কিত কিছু লিখনির একটি সংকলিত কিতাব, যা আবু রুমাইশা ইংলিশে অনুবাদ করে Diseases of the Hearts & Their Cures নামে একটি বই হিসেবে ইংলিশ ভাষার সাথে পরিচিত উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, সেই বইটি **ইংলিশ থেকে বাংলায় অনুবাদ** করা হলো বাংলাভাষী উম্মতের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।

প্রথম প্রকাশঃ ২৬ শে রবিউস সানি, ১৪৩৭ হিজরি।

বইটির অনুবাদ করেছেঃ **The Greatest Nation**

ওয়েব সাইটঃ **thegreatestnation.wordpress.com**

বইটি প্রসঙ্গে সংকলকের কিছু কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ’র জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক শেষ নবী (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর।

প্রিয় পাঠক, জেনে রাখুন যে, অন্তরের চিকিৎসা করার জন্য সময় ও শক্তি ব্যয় করা এবং এটিকে সব ধরণের অসুস্থতা ও সব পাপ থেকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করার জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়াই একজন ব্যক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারন ইসলামে অন্তর এক মহান ও উঁচু অবস্থানে অধিষ্ঠিত রয়েছে। কেননা, রব তো অন্তরের দিকেই তাকান আর এটিই হল তাওহীদ, ঈমান ও ইখলাসের ভাণ্ডার।

আল্লাহ’র দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠত্বের কারনে অন্তরের অবস্থানুসারে আমলসমূহ একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র, তাদের সংখ্যা বা ধরনের দ্বারা স্বতন্ত্র নয়; বরং সেগুলো আহ্বানকারীর শক্তি, তার সত্যবাদিতা, ইখলাস এবং সে যে পরিমাণে নিজের উপর আল্লাহকে প্রাধান্য দেয় সেটির কারনে স্বতন্ত্র। [১]

অন্তরই ভিত্তি গঠন করে, এটি হল শরীরের অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের মালিক আর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গসমূহ হল এর সৈন্য। সুতরাং, যখন মালিক পরিশুদ্ধ হয় তখন তার সৈন্যরাও পরিশুদ্ধ হয়, আর যখন মালিক নোংরা হয় তখন তার সৈন্যরাও নোংরা হয়।

মহান আল্লাহ তা’আলা আল- হাফিয ইবনে হাযার আল- আসকালানি (রহ.) এর ইলমের দ্বারা আমাদের উন্নতি সাধন করুন, তিনি বলেছেন, “অন্তর হল স্বতন্ত্র, কারন এটি শরীরের নেতা। নেতার পরিশুদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে তার অধীনস্তরা পরিশুদ্ধ হয়, আর তার বিকৃতি ঘটলে তাদেরও বিকৃতি ঘটে।

সুতরাং হে আল্লাহ গোলাম, আপনি যদি আপনার অন্তরের চিকিৎসার ইচ্ছা করেন তবে এটি তো আপনার উপরই যে, আপনি আল্লাহ’র নিকট আশ্রয় চাওয়ার ব্যাপারে সত্যনিষ্ঠ হবেন আর তার প্রতিই আস্থা রাখবেন, প্রচুর পরিমাণে নফল সালাত আদায় করবেন, উঠতে- বসতে আল্লাহ’র আনুগত্য করবেন, রাতে লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সালাত আদায় করবেন, আল্লাহ’র স্মরণে লেগে থেকে আর কেবল সৎকর্মশীলদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে আপনার অন্তরকে চিকিৎসা করবেন …… এবং বারবার কুরআন তিলাওয়াত করবেন। আল্লাহ আমাদেরকে এর সবই প্রদান করুন তার দ্বারা সুস্থ থাকার জন্য।”

সুতরাং হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা, এটি হল ‘অন্তরের ব্যাধি ও এর চিকিৎসা’ বিষয় সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়্যাহ’র একটি কিতাব। আমি এটি তার ফাতওয়া’র মধ্যে পেয়েছি আর দেখতে পেলাম যে এটি তার একটি চমৎকার কাজ, যেটিতে অনেক উপকার রয়েছে। সুতরাং হে মুসলিমরা, এই গ্রন্থটি আপনাদের প্রিয় বন্ধু ও ভাইদের মধ্যে দ্রুত বিতরন করাটা আপনাদের উপর, হয়তো আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। আল্লাহ’র সাহায্য প্রার্থনা করছি।

- ইব্রাহীম বিন ‘আবদুল্লাহ আল- হাযিমি

সংকলকের ভূমিকা

অন্তরের জীবনীশক্তির চাবিকাঠি

ইবনুল কায়্যিম (রহ.) বলেন, "অন্তরের জীবনীশক্তির চাবিকাঠি নির্ভর করে কুরআনের উপর গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা, গোপনে আল্লাহ'র সম্মুখে নম্র থাকা এবং পাপ বর্জন করার উপর।" [২]

মহান আল্লাহ বলেন,

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (٢٩)

"এক কল্যাণময় কিতাব, এটি আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যেন এর আয়াতগুলো নিয়ে তারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা সোয়াদ, ৩৮ : ২৯)

সুতরাং আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিলেন যে তিনিই এই মহান কুরআন নাযিল করেছেন যা কিনা এর বাক্য প্রকাশের ধারায়, এর অর্থে, আদেশ- নিষেধে এবং নিয়মকানুন ও বিধিবিধানে পবিত্র। এর অনুগ্রহগুলোর মধ্যে একটি হল, যে ব্যক্তি এই কিতাবের একটি শব্দও তিলাওয়াত করে তবে তার জন্য রয়েছে একটি সওয়াব আর এই সওয়াবটি দশগুণ বৃদ্ধি পায়; যেমনটি বর্ণিত হয়েছে আত- তিরমিযি কতৃক বর্ণিত হাদিসে, তিনি এটিকে হাসান সাহিহ বলেছেন।[৩]

এর অনুগ্রহগুলোর মধ্যে এটিও একটি অনুগ্রহ যে, যে ব্যক্তি কুরআন পড়ে আর এর উপর আমল করে, সে এই দুনিয়াতে পথভ্রষ্ট হবে না আর পরকালেও কোন দুঃখ- দুর্দশায় পতিত হবে না, যেমনটি ইবন আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেছেন –

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ (١٢٣)

"...যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না আর দুঃখ- কষ্টে পতিত হবে না।" (সূরা তোয়াহা, ২০ : ১২৩)

পবিত্র কুরআনের অনুগ্রহগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম অনুগ্রহ যে, যে ব্যক্তি এর শিক্ষা গ্রহণ করে আর এর শিক্ষা প্রদান করে, সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন; যেমনটা বর্ণিত হয়েছে আল- বুখারির হাদিসে – "সে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিখে আর এরপর তা শেখায়।" [৪]

এটিও কুরআনের অনুগ্রহগুলোর মধ্যে একটি অনুগ্রহ যে, এটি বিচার দিবসে এর সাথীদের জন্য শাফায়াত (সুপারিশ) করবে - যারা এটি দিয়ে দুনিয়াতে আমল করতো, যেমনটা জানা যায় ইমাম মুসলিম কতৃক তার সাহিহতে বর্ণিত দুটো হাদিস থেকে। [৫]

মহিমান্বিত আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন যেন এর অর্থগুলোর আর আদেশ-নিষেধগুলোর উপর এমনভাবে প্রতিফলন ঘটে যে, ব্যক্তি আল্লাহ’র আদেশ সংক্রান্ত কোন আয়াতের সম্মুখীন হলে সেই আদেশের অনুসরণ করবে এবং কোন নিষেধ সংক্রান্ত আয়াতের সম্মুখীন হলে সেই নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করবে।

একইভাবে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ’র রহমত সংক্রান্ত আয়াতের সম্মুখীন হলে সে আল্লাহ’র সেই রহমতের জন্য আশা করবে আর এটির জন্য দুয়া করবে। শাস্তি দ্বারা ভয়প্রদর্শন সংক্রান্ত কোন আয়াতের সম্মুখীন হলে সেই শাস্তিকে ভয় করবে আর আল্লাহ’র নিকট সেটি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর আল্লাহ’র প্রশংসা সংক্রান্ত আয়াতের সম্মুখীন হলে আল্লাহ’র প্রশংসা করবে - এগুলো করার মাধ্যমে তার ঈমান, ইলম, হিদায়াহ ও তাকওয়া বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তার ঈমানদার বান্দাদের বর্ণনায় বলেছেন,

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٢)

“আর যখন তাদের সামনে তার আয়াতগুলো পাঠ করা হয় (তখন) তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।” (সূরা আনফাল, ৮ : ২)

কুরআনের সে আয়াতগুলোতে বর্ণিত ওয়াদা ও ভয়প্রদর্শন, যা কিনা আশা ও ভয় করার প্রেরণা দেয় – সেগুলোর কারনেই এমনটি ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤)

“কুরআন নিয়ে কি তারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ ?” (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ২৪)

অন্তরকে জীবনীশক্তি দেওয়ার উপায়গুলোর মধ্যে একটি হল গোপনে আল্লাহ’র প্রতি নম্র থাকা। গোপনে আল্লাহ’র প্রতি নম্র থাকার অর্থ হলঃ রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকার সময়টাতে যখন আল্লাহ সবচেয়ে নিচের আসমানে নেমে আসেন তখন দুয়া, ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা), তাওবা করে তার কাছে ফিরে যাওয়া, তার পক্ষ থেকে বিজয় ও জান্নাত লাভের এবং দোযখ থেকে আশ্রয় চাওয়ার জন্য দুয়া করার মাধ্যমে তার জন্য আকাংখা করা, যেমনটা বর্ণিত হয়েছে নির্ভরযোগ্য এই হাদিসটিতে –

“আমাদের রব প্রত্যেক রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকতে আমাদের নিকটতম আসমানে অবতরন করে বলতে থাকেন, ‘এমন কে আছো যে আমার নিকট দুয়া করবে? আমি তার দুয়া কবুল করবো। এমন কে আছো যে আমার কাছে চাবে ? আমি তাকে দান করবো। এমন কে আছো যে তার গুনাহ মাফ চাবে ? আমি তাকে মাফ করে দিবো।’ ” [৬]

এই হাদিসটি রাতের শেষ অংশে কিয়াম করা, সালাত আদায় করা, দুয়া করা, আল্লাহ’র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, জান্নাত লাভ ও দোযখ থেকে নিরাপত্তা চেয়ে দুয়া করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য দুয়া করার ব্যাপারে উৎসাহ দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে দুয়া জন্য আদেশ দিয়েছেন আর সেটির জবাব দেওয়ার ওয়াদাও করেছেন, তিনি সকল ধরনের অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি ও অভাব থেকে মুক্ত, তিনি তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।

যে সময়গুলোতে দুয়ার জবাব পাওয়া যাবে তার মধ্যে একটি হল রাতের শেষ অংশ, আর এটি হল আল্লাহ’র একটি অনুগ্রহ যা আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন, এবং আল্লাহ তো মহা অনুগ্রহ ও উদারতার মালিক।

আর অন্তরকে জীবনীশক্তি দেওয়ার একটি উপায় হল পাপ বর্জন করা, কারন পাপ অন্তরকে হত্যা করে, যেমনটি একটি হাদিসে বলা হয়েছে -

বান্দা যখন একটি পাপ কাজ করে তখন তার অন্তরের উপর একটি কালো দাগ আবির্ভূত হয়; যদি সে ক্ষমা প্রার্থনা করে তবে সেই কালো দাগটি অপসারিত হয়, আর যদি পাপকাজে ফিরে যায় তবে সেই কালো দাগটি বৃদ্ধি পেতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অন্তর কালো হয়ে যায়, এটিই হল رَانَ যেটির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

كَلَّاۖ بَلْۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (١٤)

“না, তবে তাদের অন্তরগুলোর উপর পাপের আবরণ পড়ে গেছে, যা তারা অর্জন করতো।” (সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ : ১৪) [৭]

কবি বলেন,

“আমি দেখতে পেলাম যে পাপগুলো অন্তরগুলোকে করছে হত্যা,

তাদের আসক্তির কারনে দিচ্ছে কলঙ্কের জন্ম,

আর পাপগুলো বর্জন করার মাঝেই নির্ভর করে তার জীবন,

এবং আপনার আত্মার জন্য এটিই উত্তম যে আপনি একে বাঁচিয়ে রাখবেন।”

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

কামনা- বাসনা ও প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসাজনিত ব্যাধি

পরিশিষ্ট

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (.রহ) [৮]

" আমার কথা দিয়ে আমি তার ব্যাপারে যত না বর্ণনা করতে পারবো অথবা আমার কলম দিয়ে তিনি যে কত প্রখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন তা লোকদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবো, তিনি তার চেয়েও মহান। তার জীবন, তার জ্ঞান, তার দুঃখ- দুর্দশা এবং এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তার সফরগুলো বইয়ের বিশাল দুটো খন্ড পূর্ণ করে দিবে। "

- *ইমাম আয- যাহাবি (রহ.)*

তার নাম, জন্ম ও বংশপরিচয়ঃ

তিনি হলেন তাকিউদ্দিন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইবনে শায়খ শিহাবুদ্দিন আবদুল হালিম ইবনে আবুল কাসিম ইবনে তাইমিয়্যাহ আল- হাররানি। তিনি ৬৬১ হিজরি সনের ১০ই / ১২ই রবিউল আউওয়াল মাসে উত্তর ইরাকের হাররানে এক ইলমী ঘরানার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার পিতা আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহ তার নাম রাখেন আহমাদ তাকিউদ্দিন, বড় হলে তিনি আবুল আব্বাস ডাক নাম রাখেন। কিন্তু খানদানী উপাধি 'ইবনে তাইমিয়্যাহ' সবকিছুকে ছাড়িয়ে যায় আর এ নামেই তিনি পরিচিতি লাভ করেন।

তার পরিবারের চতুর্থ পুরুষ তার পরদাদা মুহাম্মাদ ইবনুল খিযির থেকেই পরিবারটি তাইমিয়্যাহ পরিবার হিসেবে পরিচিত হয়। মুহাম্মাদ ইবনুল খিযিরের মায়ের নাম ছিল তাইমিয়্যাহ, তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। বাগ্মীতায় তার অসাধারণ খ্যাতি কিছুদিনের মধ্যেই পরিবারটিকে তাইমিয়্যাহ পরিবার নামে সর্বত্র পরিচিত করে।

তার দাদা মাজদুদ্দিন ইবনে তাইমিয়্যাহ সেই সময়ে হাম্বলী মাযহাবের শ্রেষ্ঠ আলিমদের মধ্যে গণ্য হতেন, কেউ কেউ তাকে মুজতাহিদ হিসেবেও উল্লেখ করেন। তিনি মুনতাকা আল- আখবার নামক বিখ্যাত কিতাব রচনা করেন। পরবর্তীতে ত্রয়োদশ হিজরি সনের শ্রেষ্ঠ আলিম ও মুহাদ্দিস ইমাম শাওকানি 'নাইলুল আওতার' নামে এই কিতাবের বার খন্ডের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করে কিতাবটির গভীরতা ও শ্রেষ্ঠত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তার পিতা শিহাবুদ্দিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়্যাহও একজন শ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস ও হাম্বলি ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ছিলেন। হিরান থেকে দামেশকে চলে আসার পরপরই তিনি দামেশকের জামে উমুবিতে দরসের সিলসিলা চালু করেন। দামেশকের এ কেন্দ্রীয় মসজিদটি ছিল দেশের শ্রেষ্ঠ উলামা, ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের কেন্দ্রস্থল। কাজেই সেখানকার শ্রেষ্ঠ আলিমদের উপস্থিতিতে দরস দেওয়া চাট্টিখানি কথা ছিল না। তার দরসের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি সম্পূর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বড় বড় কিতাবের বরাত দিয়ে দরস করে যেতেন, সামনে কোন কিতাবই থাকতো না। দামেশকের দারুল হাদিস আসসিকরিয়ায় তাকে হাদিস ও হাম্বলি ফিকহের উপর শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

তার শিক্ষকঃ

ইবনে তাইমিয়্যাহ তার পিতা এবং অনেক প্রখ্যাত আলিম থেকে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দুইশ'র বেশী আলিম ও আলিমাহ থেকে দ্বীনের ইলম হাসিল করেন। তাদের মধ্যে কয়েকজন আলিম ও আলিমাহ হলেন - আবু আল- আব্বাস আহমাদ ইবনে আবদুদ দা'ইম আল- মাকদাসি, আবু নাসর আব্দুল- আযিয ইবনে আব্দুল- মুন'ইম, আবু মুহাম্মাদ ইসমা'ইল ইবনে ইব্রাহিমি তানুখি, সিত আদ- দার বিনতে আবদুস সালাম ইবনে তাইমিয়্যাহ, আহমাদ ইবনে আহমাদ আশ শাফি'ই, শারফুদ্দিন আল- মাকদাসি প্রমুখ।

ইবনে তাইমিয়্যাহ'র পিতা তাকে সাত বছর বয়সে দামেস্কে নিয়ে যাওয়ার ফলে তার সৌভাগ্য হয় শ্রেষ্ঠ আলিমদেরদের সংস্পর্শে থেকে ইলম হাসিল করার। তিনি কখনো কখনো একটি আয়াতের অর্থ অনুধাবনের জন্য একশটির বেশী তাফসীর অধ্যয়ন করতেন। তিনি শুধুমাত্র তাফসীর কিতাব পাঠের মাধ্যমেই নিজের জ্ঞান স্পৃহাকে আবদ্ধ করে রাখতেন না, বরং তিনি মুফাসসিরদের কাছে চলে যেতেন আর তাদের সাথে সরাসরি আলোচনা করতেন। তিনি ফিকহ ও হাদিসের বড় বড় আলিমদের পাঠচক্রে গিয়ে তাদের কাছ থেকে ইলম অর্জন করতেন, এমনকি তাদের সাথে বিতর্কও করতেন, অথচ তিনি তখনও যুবক ছিলেন।

তার জ্ঞানগত মর্যাদাঃ

ইবনে তাইমিয়্যাহ'র যুগে ইসলামী জ্ঞান- বিজ্ঞান এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিলো এবং কুরআন ও হাদিসশাস্ত্রের এতো বিশাল ও বিস্তৃত ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিলো যে, কোন লোকের পক্ষেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হওয়া ছাড়া সে সব জ্ঞানভাণ্ডার আয়ত্তে আনা যেমন সম্ভব ছিল না, তেমনি বিতর্কিত মাসাইল ও সমস্যার ক্ষেত্রে সমসাময়িক খ্যাতনামা আলিম ও পন্ডিত ব্যক্তিদের সামনে কেউ মুখ খোলার সাহস করতেও পারতো না। একই সাথে কোন মাসআলার ব্যাপারে পূর্ববর্তী কোন আলিমের পেশকৃত সিদ্ধান্তের সাথে মতভেদের অধিকারও থাকতো না।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ইবনে তাইমিয়্যাহকে যে স্মৃতিশক্তি ও ধারণশক্তি দান করেছিলেন তার সাহায্যে তিনি তাফসীর, হাদিস, রিজালশাস্ত্র, ফিকহ, উসুল, উসুলে ফিকহ, সিরাত, আসার, ইমামদের মতভেদ সম্পর্কিত বিষয়শাস্ত্র, কালামশাস্ত্র, ইতিহাস, অভিধান ও ব্যাকরণশাস্ত্রের যে বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার তখন পর্যন্ত গড়ে উঠেছিলো, যত কিতাব ও উৎস- উপকরণ তখন পর্যন্ত বর্তমান ছিল এবং যে পর্যন্ত তার দক্ষতা ও ক্ষমতা ছিল, সেগুলো অধ্যয়ন করেন আর তার শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত স্মৃতিশক্তির সাহায্যে সেগুলো নিজের বুকে ধারণ করেন। এরপর তিনি তার জ্ঞানগত ও লেখক জীবনে সেগুলো থেকে সেভাবে সাহায্য সহায়তা গ্রহণ করেন যেভাবে একজন যুদ্ধাভিজ্ঞ তীরন্দাজ তার তূণীরের সাহায্য নিয়ে থাকে।

সমসাময়িক সকলেই তার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, ধারণ ক্ষমতা, উল্লেখযোগ্য মেধা ও ধীশক্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং তার সমসাময়িক ও পরবর্তী যুগের সকলেই তার এ গুনের ব্যাপারে একমত। তার কিছু সমসাময়িক ব্যক্তি এমন পর্যন্ত বলেছেন যে কয়েক শতাব্দী যাবত এতো বড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী আর কেউ জন্মগ্রহণ করেননি।

একবার তিনি সূরা ইখলাসের প্রথম আয়াত - "বলঃ তিনি আল্লাহ, এক ও অদ্বিতীয়।" - এর এমন এক তাফসীর করেন যেটি লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে তা বড় এক খন্ডের তাফসীরে রূপ নিলো, এটি তাফসীরে সুরাতুল ইখলাস নামে পরিচিত। সূরা তোয়া- হা এর পঞ্চম আয়াত - "আর- রহমান আরশে সমাসীন।" - এর তাফসীর প্রায় ৩৫ খন্ড পূর্ণ করে দিয়েছিলো। জুমুআর দিনে তিনি সূরা নূহ এর তাফসীর করা শুরু করলে কয়েক বছর যাবত এই তাফসীর চলতে থাকে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ তার ধারালো বোধশক্তি দ্বারা সহজেই কুরআনের সবচেয়ে জটিল অর্থগুলোর অনুসন্ধান করতে পারতেন। তার ক্লাসে কোন ছাত্র কোন আয়াত পাঠ করলে তিনি সেই আয়াতের তাফসীর করা শুরু করতেন, আর সেই তাফসীরের দীর্ঘতা এমন হতো যে সেটি দিয়েই ক্লাস সমাপ্ত হতো। সময়ের ঘাটতি বা ছাত্রদের বিশ্রাম দেওয়া ছাড়া তিনি তাফসীর প্রদানে থামতেন না। তিনি অনেক দৃষ্টিকোণ থেকেই আয়াতের তাফসীর করতে পারতেন।

একবার তাকে একটি হাদিস [৯] – "আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে অভিশাপ দিয়েছেন, যে ব্যক্তি একজন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে বিয়ে করে তার প্রথম স্বামীর জন্য তাকে হালাল করার উদ্দেশ্যে, এবং সেই স্বামীকেও যে সেই নারীকে ফিরিয়ে নেয়।" - সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি এর এমন এক বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন যে যেটি লিপিবদ্ধ করলে তা পুরো এক খন্ডের কিতাবে পরিণত হয়, এই কিতাবটি 'ইকামাত আদ- দালিল 'আলা বুতলান আত- তাবিল নামে পরিচিত। এটি একেবারেই বিরল যে তার নিকট কুরআনের কোন আয়াত বা কোন হাদিস বা বিধানের ব্যাপারে উল্লেখ করা হলে তিনি পুরো দিন জুড়ে এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করতেন না।

ইমাম আয- যাহাবি বলেন, "হাদিসের মূল পাঠ 'মতন' অধিক পরিমাণে মনে রাখতে, সময়মত তা থেকে সহায়তা গ্রহণ করতে, বিশুদ্ধ বরাত প্রদানে এবং সম্পর্ক সূত্র বর্ণনায় তার চেয়ে অধিক পারদর্শী আর কাউকেই আমি দেখিনি। হাদিসের বিপুল বিস্তৃত ভান্ডার যেন তার চোখের সামনে ও ঠোঁটের কোণে ভেসে বেড়াতো। ... তার সম্পর্কে এ কথা বলা যথার্থ হবে যে, ইবনে তাইমিয়্যাহ যে হাদিস জানেন না তা কোন হাদিসই না।"

মহান আল্লাহ তাকে আলিমদের ইখতিলাফ, তাদের বক্তব্য, ভিন্ন বিষয়ে তাদের ইজতিহাদ এবং প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক আলিমদের শক্ত, দুর্বল, গৃহীত ও প্রত্যাখ্যাত মতামত সম্পর্কে ইলম হাসিলের তাওফিক দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তার খুব সূক্ষ্মদৃষ্টি ছিল যে, তাদের কোন মতামতটি ছিল সবচেয়ে বিশুদ্ধ আর সত্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী, আর তিনি সেটি প্রত্যেক আলিমের নাম উল্লেখ করেই করতে পারতেন। তাকে যদি কোন মতামতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হতো তবে তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রত্যেক হাদিস, সাহাবী ও প্রথম প্রজন্মের আলিম থেকে তার প্রজন্ম পর্যন্ত আলিমদের উক্তি – এসব কিছু থেকে তিনি যেটি ইচ্ছা করতেন সেটি গ্রহণ করতেন আর যেটি ইচ্ছা সেটি ত্যাগ করতেন। তার সাথীরা তার চল্লিশ হাজারের বেশী ফাতওয়ার সঙ্কলন করেন। এটি খুবই দুর্লভ যে তাকে কোন কিছুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি দ্রুত তার জবাব দিতে পারেননি, তিনি এটির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তার জবাবগুলো একেকটি কিতাবে পরিণত হতো।

একবার এক ইয়াহুদী তাকে ৮ লাইনের কবিতা আকারে আল- কদর সম্পর্কে প্রশ্ন করে। তিনি এর জবাব দেন ১৮৪ লাইনের কবিতা দিয়ে, এই কবিতাটি ব্যাখ্যা করার জন্য দু- দুটো বড় খন্ডের কিতাব রচনার প্রয়োজন হতো।

আরবি ব্যাকরণে ইবনে তাইমিয়্যাহ এমনই দক্ষতা অর্জন করেন যে সে সময়কার বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ আবু হাইয়ান তার কাছে যান আর তার প্রশংসায় কবিতা লিখেন। ইবনে তাইমিয়্যাহ আরবি ব্যাকরণের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় কিতাব, ইমাম সিবাওয়াহ এর 'আল- কিতাব' বিশেষ যত্ন ও মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করেন আর এর দুর্বল স্থান ও ভুল ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন। আর এই কিতাবের আশিটি স্থানে ভুলের উল্লেখ করার পর আবু হাইয়ান চিরদিনের জন্য তার বিরোধী ও সমালোচকে পরিণত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি মাত্র বাইশ বছর বয়সে দারুল হাদিস আসসিকরিয়ায় তার প্রথম দরস প্রদান করেন। এ দরস প্রদানকালে দামিশকের বড় বড় আলিম উপস্থিত ছিলেন। তারা তার দরস দ্বারা প্রভাবিত হোন এবং যুবক ইবনে তাইমিয়্যাহ'র জ্ঞানের গভীরতা, উপস্থিত বুদ্ধি, সাহসিকতা ও ভাষার অলংকারের স্বীকৃতি দান করেন। এ দরসের প্রায়

এক মাস পর তিনি জুমুয়ার দিনে তার পিতার স্থলে উমাইয়া মসজিদে তাফসীরের দরস প্রদান করেন। তার জন্য বিশেষভাবে মিম্বর রাখা হয়েছিলো। তার তাফসীর শোনার জন্য দিনে দিনে লোক সমাগম বাড়ছিলো।

যেহেতু তিনি ছিলেন একজন মুজতাহিদে মুতলাক, তাই তিনি নিজেকে নির্দিষ্ট কোন মাযহাবে আবদ্ধ করে রাখেননি, বরং মুজতাহিদে মুতলাক হওয়ার ফলে তিনি তার মতামতের ক্ষেত্রে সরাসরি শারিয়াহ'র উৎসে চলে যেতে পারতেন।

তাকিউদ্দিন ইবনে দাকিকুল ঈদ এর মর্যাদা হাদিসশাস্ত্রে সর্বজনস্বীকৃত এবং সে যুগের উলামায়ে কেরাম সর্বতোভাবে তাকে তাদের ইমাম ও মুরব্বী হিসেবে মানতেন। ৭০০ হিজরি সনে ইবনে তাইমিয়্যাহ মিসরে গেলে ইবনে দাকিকুল ঈদের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। এই সাক্ষাতের পর তিনি তার মনোভাব এভাবে ব্যক্ত করেন - "ইবনে তাইমিয়্যাহ'র সাথে আমার যখন সাক্ষাৎ হল তখন আমি অনুভব করলাম যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখাই তার নখদর্পণে; তিনি যেটি ইচ্ছা গ্রহণ করেন আর যেটি ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন।"

প্রখ্যাত আলিম ও বহু শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিত কামালুদ্দিন ইবনুয- যামালকানী বলেন, "জ্ঞানবিজ্ঞানের কোন শাখায় তাকে যখন কোন প্রশ্ন করা হয় তখন (অবলীলায় তাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে দেখে) দর্শক ও শ্রোতা মনে করে যে তিনি কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়টিই জানেন এবং তার সম্পর্কে এই ধারণা করতে বাধ্য হোন যে এই শাস্ত্রে তার মতো জ্ঞানী আর কেউ নেই।"

ইমাম আয- যাহাবির মতো বিস্তৃত দৃষ্টির অধিকারী ঐতিহাসিক ও সমালোচক মনীষী তার ব্যাপারে বলেছেন, "যদি রুকন ও মকামে ইব্রাহীমের মাঝে আমাকে কেউ কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করে তবে আমি হলফ করে বলবো, ইলমের ক্ষেত্রে তার মতো আর কেউকে আমি দেখিনি এবং তিনিও তার সমতুল্য আর কাউকে দেখেননি।"

যদিও ইতিহাস তার বিষয় ছিল না আর এটিকে তিনি তার আলোচ্য বিষয় হিসেবেও গ্রহণ করেননি, এরপরেও ইতিহাস সম্পর্কে তার জ্ঞানের গভীরতা, প্রশস্ত দৃষ্টি ও উপস্থিত বুদ্ধির একটি বিস্ময়কর ঘটনা ইবনুল কায়্যিম বর্ণনা করেন, ঘটনাটি হলঃ

একটি মুসলিম দেশে (সম্ভবত সিরিয়া বা ইরাকে) ইয়াহুদীরা একটি প্রাচীন দস্তাবেজ (লিখিত দলীল) পেশ করে, যা দেখে তা প্রাচীনকালে লিখিত এবং কাগজও বেশ পুরনো আমলের মতো বলে মনে হচ্ছিলো। সেখানে লিখিত ছিল, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) খায়বারের ইয়াহুদীদেরকে জিযিয়া প্রদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। লিখিত দস্তাবেজটির উপর আলী (রাঃ), সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) ও সাহাবীদের অনেকেরই সিগনেচার ছিল। ইতিহাস ও জীবন- চরিত সম্পর্কে আর সে যুগের অবস্থা সম্পর্কে গভীর ও বিস্তৃত দৃষ্টি ছিল না এমন কিছু অজ্ঞ লোক ইয়াহুদীদের এই প্রতারনার শিকার হয় ও এর যথার্থতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে যায় আর তারা এর উপর আমল করতে শুরু করে এবং ইয়াহুদীদেরকে জিযিয়া প্রদানের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এ দস্তাবেজ ইবনে তাইমিয়্যাহ'র সামনে উপস্থাপন করা হলে তিনি একে বিশ্বাসের একেবারেই অযোগ্য ও জাল বলে মত প্রকাশ করেন এবং এর জাল ও বানোয়াট হওয়া সম্পর্কে দশটি দলীল পেশ করেন। এগুলোর মধ্যে একটি দলীল হল এই যে, দস্তাবেজের উপর সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) এর সিগনেচার আছে, অথচ খায়বার যুদ্ধের আগেই তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দস্তাবেজে উল্লেখ রয়েছে যে ইয়াহুদীদেরকে জিযিয়া থেকে রেহাই দেওয়া হয়েছে, অথচ তখন পর্যন্ত জিযিয়ার হুকুমই নাযিল হয়নি আর সাহাবীরাও এ সম্পর্কে কিছু জানতেন না। জিযিয়ার হুকুম খায়বারের যুদ্ধের তিন বছর পর তাবুক যুদ্ধের বছরে নাযিল হয়। তৃতীয়ত, এতে উল্লেখ রয়েছে যে ইয়াহুদীদেরকে বেগার (বিনা মজুরির শ্রম) খাটানো যাবে না; এটি একটি অবান্তর বিষয়, কারন ইয়াহুদী বা অ- ইয়াহুদী কারো থেকেই বেগার শ্রম গ্রহণ রীতিসিদ্ধ ছিল না। নিশ্চয়ই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবীরা এ ধরণের জুলুম ও জবরদস্তি

থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন; বরং এটি তো হল অত্যাচারী ও নিপীড়ক বাদশাহদের আবিষ্কার যা আজ পর্যন্ত চলে আসছে। চতুর্থত, জ্ঞানী- গুণী, সিয়ার ও মাগাযির লেখক, মুহাদ্দিস, ফকিহ ও মুফাসসিরদের কেউই এ ধরণের কোন দস্তাবেজের উল্লেখ বা আলোচনা করেননি এবং ইসলামের প্রথম যুগগুলোতেও এ দলীলের অস্তিত্ব প্রকাশ পায়নি। তাই সঙ্গত কারনেই বলা চলে যে এ দস্তাবেজ জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট এবং এ ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। শায়খুল ইসলামের উল্লেখিত বিশ্লেষণে ইয়াহুদীদের সকল জারিজুরি ফাঁস হয়ে যায় আর তাদের কৃত্তিমতার সকল মুখোশ খুলে পড়ে।

যুহদ ও ইবাদাতঃ

ইবনে তাইমিয়্যাহ যখন অল্পবয়স্ক ছিলেন, তখন তার পিতা তার কুরআনের শিক্ষককে চল্লিশ দিরহাম দিয়ে বললেন যে তিনি যেন তার সন্তানকে কুরআন তিলাওয়াত ও এর উপর আমল করানোয় উৎসাহ প্রদান করার উদ্দেশ্যে তাকে প্রতি মাসে সেই চল্লিশ দিরহাম প্রদান করেন। সুতরাং তার শিক্ষক যখন তাকে এই চল্লিশ দিরহাম দিতে গেলেন তখন ইবনে তাইমিয়্যাহ তা গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করলেন আর বললেন, "হে আমার শিক্ষক, আমি আল্লাহ'র নিকট ওয়াদা করেছি যে আমি কুরআনের জন্য কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করবো না।"

ইবনুল কায়্যিম বলেন, "ফজরের সালাত আদায়ের পর তিনি স্বস্থানেই বসে থাকতেন আর বসে থাকতে থাকতেই বেলা বেড়ে যেতো। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেনঃ এটিই আমার নাস্তা, এটি গ্রহণ না করলে আমার শক্তিতে ভাটা পড়বে আর শেষ পর্যন্ত আমার কর্মশক্তিই লোপ পাবে।"

ইমাম আয- যাহাবি বলেন, "তার মতো কাঁদতে, আল্লাহ'র দরবারে সাহায্য চাইতে ও ফরিয়াদ জানাতে এবং তারই দিকে তাওাজ্জুহ (গভীর মনোনিবেশ) করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। ...... তিনি বিশেষ বিশেষ সময়ের আমল ও যিকরসমূহ পাবন্দীর সাথে এবং সর্বাবস্থায় অত্যন্ত যত্নের সাথে আদায় করতেন।"

আল কাওাকিব কিতাবে তার ব্যাপারে উল্লেখ আছে যে তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন তার কাঁধ ও অঙ্গ- প্রত্যঙ্গাদি কাঁপত, এমন কি ডানে বামে স্পন্দিত ও শিহরিত হতো।

শায়খ 'আলামুদ্দিন আল- বারযালী বলেন, "শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার অবস্থা একই রকম ছিল, আর সেটি হল এই যে, তিনি দারিদ্র্যকেই সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছেন। দুনিয়ার সাথে নামকাওয়াস্তে অর্থাৎ যতটুকু না হলেই নয়, ততটুকু মাত্র সম্পর্ক রেখেছিলেন, আর যেটুকু পেয়েছেন তাও ফিরিয়ে দিয়েছেন।"

তার দানশীলতা এমনই ছিল যে, দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে তিনি সতর ঢাকার পরিমাণ কাপড় রেখে শরীরের কাপড় খুলে তা দিয়ে দিতেন। খাবারের ভেতর থেকে একটি দুটি রুটি বাঁচিয়ে রাখতেন আর নিজের প্রয়োজন উপেক্ষা করে অন্যকে তা দিয়ে দিতেন।

তিনি ছিলেন একজন ক্ষমাশীল ব্যক্তি। তার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ কাযী ইবনে মাখলুফ মালিকী তার সম্পর্কে বলে, "আমরা ইবনে তাইমিয়্যাহ'র মতো মহান ও উদারচেতা আর কাউকে দেখিনি। আমরা সুলতানকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছি, কিন্তু তিনি ক্ষমতা পাওয়ার পর আমাদেরকে পরিস্কার মাফ করে দিয়েছেন আর উল্টো আমাদের পক্ষে সুপারিশ করেছেন।"

ইবনুল কায়্যিম বলেন, “তিনি শত্রুর জন্যও দুয়া করতেন, আমি তাকে একজনের বিরুদ্ধেও বদদুয়া করতে দেখিনি। একদিন আমি তার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ও এমন এক মানুষের মৃত্যুর খবর নিয়ে আসলাম, যে শত্রুতা সাধনে ও যন্ত্রণা প্রদানে সকলের তুলনায় অগ্রগামী ছিলো। তিনি আমাকে ধমক দিয়ে আমার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আর ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রজিউন’ পাঠ করলেন। এরপর তিনি তার বাড়িতে গেলেন, তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করলেন, সমবেদনা জানালেন আর পরিবারের লোকদের (সান্ত্বনা দিয়ে) বললেনঃ তিনি চলে গেলেও আমি তো রয়েছি। তোমাদের যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবে, আমি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে সাহায্য করবো।”

হাফিয সিরাজুদ্দিন আল- বাযযার বলেন, “আল্লাহ’র কসম! আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এতো আদব ও এতো ভক্তি- সম্মান প্রদর্শনকারী, তার আনুগত্য ও অনুসরণকারী এবং দ্বীনের সাহায্য করতে আগ্রহী – ইবনে তাইমিয়্যাহ’র চেয়ে বেশী আর কাউকে দেখিনি।”

‘আল্লামা ‘ইমাদুদ্দিন আল- ওয়াসিতি বলেন, “আমরা আমাদের যুগে একমাত্র ইবনে তাইমিয়্যাহকেই পেয়েছি , যার জীবনে নবুওওয়াতে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নূর এবং যার কথায় ও কাজে সুন্নাহ’র আনুগত্য ও অনুসরণ স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল। সুস্থ মন- মানস এ কথার সাক্ষ্য দিতো, প্রকৃত আনুগত্য ও পরিপূর্ণ অনুসরণ একেই বলে।”

এছাড়াও ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ তাতার, খ্রিস্টান আর রাফেজিদের বিরুদ্ধে জিহাদে এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

<u>সংগ্রামী জীবনঃ</u>

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ এমন এক সময়ে জন্মলাভ করেছিলেন সে সময়টাতে এই উম্মাহ’র জন্য তার মতো এ মহান ব্যক্তিত্বের খুবই দরকার ছিল। উম্মাহ’র মধ্যে শিরক, বিদআত ও বিভিন্ন বিভ্রান্তিপূর্ণ মতবাদের অনুপ্রবেশ, হিংস্র তাতারিদের বর্বর আক্রমণসহ বিভিন্নমুখী বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে দৃঢ়পদে রুখে দাঁড়িয়ে ও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি এই উম্মাহকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তবে শুধুমাত্র এটুকু বলার মাধ্যমেই তার সংগ্রামী জীবন প্রকৃতভাবে অনুধাবন করা সম্ভব না আর এটি তার কোন জীবনীগ্রন্থও নয় যে তার ব্যাপারে বিস্তারিত উল্লেখ করা হবে, বরং খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য এখানে উপস্থাপন করা হবে।

আল- বাযযার বলেন, “প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি এ ব্যাপারে একমত যে ইবনে তাইমিয়্যাহ হলেন সেই ব্যক্তিদের একজন, যার ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ এ উম্মাতের জন্য প্রতি শতাব্দীতে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন যিনি দ্বীনের সংস্কার করবেন।’ [১০] আল্লাহ তার মাধ্যমে শারিয়াহ’র ইস্যুগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন, যেগুলো সময়ের পরিবর্তনে বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলো এবং আল্লাহ তার যুগের সকল লোকদের বিরুদ্ধে তাকে প্রমাণ হিসেবে স্থাপন করলেন। সকল প্রশংসা তো একমাত্র রব্বুল আ’লামিন আল্লাহ’র।”

সপ্তম হিজরির প্রথমার্ধে ‘তাতার’ শব্দটিই ছিল মুসলিমদের কাছে ভীতি ও আতংকের প্রতীক। তাতারিদের হাতে একের পর এক মার খেতে খেতে মুসলিমরা বিশ্বাস করে নিয়েছিল যে তাতারিরা অজেয়। আরবিতে একটা প্রবাদ ছিল তাদের ব্যাপারে – ‘যদি বলা হয় তাতারিরা হেরে গেছে তাহলে সে কথা বিশ্বাস করো না।’ তারা ছিল এমনই বর্বর যে

ঐতিহাসিক ইবনে আসির তাদের সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "… তারা গর্ভবতী মেয়েদের পেট তরবারি দিয়ে ফাটিয়ে দিয়েছে আর পেট থেকে বের হয়ে আসা অপরিপুষ্ট বাচ্চাকেও টুকরো টুকরো করেছে।"

ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম তাতারি শাসক কাযান ৬৯৯ হিজরিতে সিরিয়া আক্রমণের জন্য দামেস্ক অভিমুখে সেনাবাহিনী সহকারে যাত্রা শুরু করে, এরপর দামেস্কের বাইরে কাযান ও সুলতানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিমরা দৃঢ়তা ও বীরত্বের সাথে লড়াই করার পরও তাতারিদের কাছে পরাজিত হয়। সুলতানের বাহিনী মিসর অভিমুখে রওনা হয়, দামেস্কবাসি শহরের অভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে, বড় বড় উলামায়ে কেরামগণ ও নেতৃস্থানীয় লোকেরা মিসর অভিমুখে পাড়ি জমানোর চিন্তা শুরু করে দিলো, অনেকে এর মধ্যেই শহর ছেড়ে চলে যায়, কয়েদীরা জেল ভেঙে বের হয়ে শহরে তান্ডব চালিয়ে দেয়, অসৎ ও চরিত্রহীন লোকেরা এ সুযোগ কাজে লাগায়। এমন এক কঠিন পরিস্থিতিতে ইবনে তাইমিয়্যাহ ও শহরের সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ এক পরামর্শসভায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তারা কাযানের সাথে দেখা করবেন। ইবনে তাইমিয়্যাহ'র সাথে যাওয়া এক সাথী শাইখ কামালুদ্দিন ইবনুল আনযা কাযানের সাথে সেই সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দেন এভাবেঃ

"আমি শায়খের সঙ্গে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি কাযানকে আদল ও ইনসাফ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদিস আর এ সম্পর্কিত হুকুম- আহকাম শোনাচ্ছিলেন। তার আওয়াজ ক্রমান্বয়ে উঁচু হচ্ছিলো আর তিনি ক্রমেই কাযানের নিকটবর্তী হচ্ছিলেন, এমন কি এক পর্যায়ে তার হাঁটু কাযানের হাঁটুর সাথে লেগে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশ্য কাযান তাতে কিছু মনে করেনি। সে অত্যন্ত মনোযোগের সাথে শায়খের কথা শুনছিল। তার সমগ্র দেহ- মন শায়খের প্রতি নিবিষ্ট ছিল। শায়খের প্রতি ভক্তিযুক্ত ভয় ও প্রভাব তাকে এতটা আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো আর সে তা দিয়ে এতো বেশী প্রভাবিত ছিল যে সে সমস্ত লোকদের জিজ্ঞেস করলো, 'কে এই আলিম ? আমি আজ পর্যন্ত এমন লোক দেখিনি আর এ ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর সাহসী ও শক্ত অন্তঃকরণের ব্যক্তি আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। আজ পর্যন্ত আমার উপর কারো আর এমন প্রভাব পড়েনি।' লোকেরা তার পরিচয় তুলে ধরেন আর তার জ্ঞান, বিদ্যাবত্তা ও আমলি কামালিয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ইবনে তাইমিয়্যাহ কাযানকে বলেন, 'তুমি দাবী করো যে তুমি মুসলিম, আর আমি জানতে পেরেছি যে তোমার সাথে কাযি, ইমাম আর মুওাযযিনও সাথে থাকে। কিন্তু এরপরেও তুমি মুসলিমদের উপর হামলা করেছো। …… আল্লাহ'র বান্দাদের উপর তুমি যুলুম করেছো।' "

এটি ছিল শায়খ ইবনে তাইমিয়্যাহ'র সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের একটা উদাহারন মাত্র।

৭০২ হিজরিতে তাতারিদের সাথে চূড়ান্ত যুদ্ধের পূর্বে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে - তাতারিরা মুসলিম, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ইসলামী শারিয়াহ মতে যুক্তিসঙ্গত হতে পারে ? উলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে দ্বিধা- দ্বন্দ্বের শিকার হলে ইবনে তাইমিয়্যাহ সব সংশয়ের নিরসন ঘটিয়ে বলেন যে তারা খারেজীদের ন্যায় বিবেচিত হবে। তিনি আলিমদেরকে এর ব্যাখ্যা দিলে আলীমগণ সেই ব্যাখ্যা মেনে নেন। এরপর ইবনে তাইমিয়্যাহ সুলতানের সাথে দেখা করে তার সাথে আলোচনা করার মাধ্যমে সুলতানের মনোবল ও দৃঢ়তা বৃদ্ধি করেন। সুলতান তাকে অনুরোধ করেন যুদ্ধের সময় সুলতানের সাথে থাকার জন্য। অতঃপর ৩রা রমাদান সিরিয়া ও মিসরের বাহিনীর সাথে তাতারিদের যুদ্ধ শুরু হয়, এক প্রচন্ড যুদ্ধের পর মুসলিমরা জয় লাভ করেন। ৪ঠা রমাদান ইবনে তাইমিয়্যাহ দামেস্কে প্রবেশ করলে লোকেরা তাকে মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনা জানায়, মুবারাকবাদ দেন আর তার জন্য দুয়া করেন।

এছাড়া রাফেযি (বাতিনী, ইসমাঈলী, হাকিমী ও নুসায়রী) গোত্রগুলো, যারা ক্রুসেডার ও তাতারিদেরকে মুসলিমদের উপর হামলা পরিচালনায় উস্কানি দিয়েছিলো আর এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করেছিলো, তিনি ৭০৫ হিজরিতে সেসব ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করেন।

উম্মাহ'র মধ্যে আকিদাহগত যে ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে পড়েছিলো, তিনি তার বিরুদ্ধেও জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ওয়াহদাতুল উজুদ, কবর ও মাযার পূজা, আল্লাহ'র ব্যাপারে ঠাট্টা করা ইত্যাদি শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র ঝাণ্ডা দৃঢ়ভাবে বহনের মাধ্যমে সংগ্রাম করে যান আর হককে পুনরজ্জীবিত করেন।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকিদা এবং খুলাফায়ে রাশেদিন ও সাহাবায়ে কেরামদের পবিত্রতা ও মর্যাদা রক্ষায় ইবনে তাইমিয়্যাহ বিভিন্ন সময়ে শক্ত হাতে কলম ধরেছিলেন। সমসাময়িক শিয়া আলিম ইবনুল মুতাহহিরের একটি বই ছিল, যেটির ব্যাপারে শিয়াদের গর্ব ছিল যে আহলে সুন্নাহ'র কোন আলিমের পক্ষেই এই বইটির জবাব দেওয়া সম্ভব না। হযরত আলী (রাঃ) ও আহলে বাইতের ইমামত ও নিস্পাপতা, প্রথম তিন খলীফার খিলাফাহ'র অবৈধতা এবং সাধারণভাবে সকল সাহাবীদের চরিত্র হনন ছিল এই বইটির প্রধান আলোচ্য বিষয়। বইটি আকায়েদ, তাফসীর, হাদিস ও ইতিহাসসহ বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আলোচনা ও জটিল তত্ত্বকথায় ভরপুর ছিল, তাই একজন সর্বজ্ঞান বিশারদ পন্ডিত ব্যক্তির পক্ষেই এ বইটির সমুচিত জবাব দেওয়া সম্ভব ছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ছিলেন সেই যোগ্য ব্যক্তি যিনি এই বইটির উপযুক্ত জবাব দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কিতাবু মিনহাজিস সুন্নাতিন নাবাওিয়্যাহ ফি নাকদি কালামিশ শিয়াতি ওয়াল কুদরিয়্যা (সংক্ষেপে 'মিনহাজুস সুন্নাহ' নামে পরিচিত) নামে একটি কিতাব লিখে সেই বইটির উপযুক্ত জবাব প্রদান করেন।

এছাড়াও বুদ্ধিবৃত্তিক সংস্কারের ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিয়্যাহ'র অন্যতম অবদান হল তিনি দর্শন, যুক্তিবাদ ও কালামশাস্ত্রের বিশদ সমালোচনার গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন আর অকাট্য যুক্তি –প্রমাণের আলোকে কুরআন সুন্নাহ'র দাওয়াতি পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরেছেন। এখানে এর সামান্য কিছু উল্লেখ করা হলঃ

গ্রীক দার্শনিকদের ইলাহিয়্যাত সংক্রান্ত অনুমান নির্ভর বক্তব্যের চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণের পর ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে ইবনে তাইমিয়্যাহ প্রশ্ন রেখেছেন যে নবী- রসূলদের ঐশী জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মুকাবিলায় নিজেদের বাজে আন্দাজ অনুমানগুলো পেশ করার নির্বোধ আস্পর্ধা তারা দেখায় কি করে। তিনি লিখেছেন, "দর্শনের আদি গুরু এরিস্টটলের ইলাহিয়্যাত সংক্রান্ত আলোচনা খুঁটিয়ে দেখলে যে কোন সচেতন পাঠক এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হবেন, রব্বুল আ'লামিনের পরিচয় সম্পর্কে অজ্ঞতার ক্ষেত্রে গ্রীক দার্শনিকদের সত্যিই কোন তুলনা নেই। তা সত্ত্বেও কিছু সংখ্যক অর্বাচীন যখন গ্রীকদের অতিপ্রাকৃত দর্শনকে রসূলদের ঐশী জ্ঞান ও শিক্ষার মুকাবিলায় টেনে আনে তখন বিস্ময়ে বেদনায় নির্বাক হওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কেননা, ব্যাপারটি তখন গ্রাম্য জমিদারকে শাহানশাহের সাথে তুলনা করার মত দাঁড়ায়, বরং আরও জঘন্য। কেননা, শাহানশাহ যেমন গোটা সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপক, তেমনি জমিদার তার গ্রামের ব্যবস্থাপক, তাই উভয়ের মাঝে দূরতম সাদৃশ্য অন্তত রয়েছে। অথচ নবী ও দার্শনিকদের মাঝে সেটুকুও নেই। কেননা নবীরা যে ইলম ধারণ করেন সে সম্পর্কে দার্শনিকদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান নেই, এমন কি তার ধারে কাছে ঘেঁষাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সত্যি বলতে কি, ইয়াহুদী আর খ্রিস্টান ধর্মনেতারাও তাদের থেকে আল্লাহ- তত্ত্বে অধিক অবগত। এখানে আমি কিন্তু ওহীনির্ভর ইলমের কথা বুঝাতে চাচ্ছি না, সে ইলম আমাদের আলোচনার বিষয়ই নয়। কেননা তা শুধু নবীদেরই বৈশিষ্ট্য, অন্যদের তাতে কোন অংশ নেই। আমি আকল ও বুদ্ধিজাত সে ইলমের কথাই বুঝাতে চাচ্ছি যার সম্পর্ক হল তাওহীদ ও রিসালাতের সাথে, আল্লাহ'র যাত ও সিফাত তথা সত্তা ও গুনের পরিচয়ের সাথে এবং পরকাল ও পরকালীন সৌভাগ্যের নিয়ামক আমলগুলোর সাথে, যেগুলোর অধিকাংশই নবীরা আকল ও বুদ্ধিজাত প্রমাণাদির সাথে বর্ণনা করেছেন। দ্বীন ও

শরীয়তের এই বুদ্ধিজাত ইলম সম্পর্কেই আমাদের দার্শনিক বন্ধুরা সম্পূর্ণ বেখবর। ওহীনির্ভর ইলমের তো প্রশ্নই আসে না, কেননা সেগুলো নবীদের একক বৈশিষ্ট্য। সুতরাং দর্শন ও নববী ইলমের তুলনামূলক আলোচনায় সে প্রসঙ্গ আমরা উত্থাপনই করবো না।”

মুসলিম মনীষীদের উপর যুক্তিবাদের প্রভাব দর্শনশাস্ত্রের থেকে কম ছিল না। এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে যুক্তিবাদ হল আগাগোড়া বুদ্ধি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, নির্ভুল ও বিশুদ্ধ শাস্ত্র যা সত্য মিথ্যা- নির্ধারণের একটি নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। তাই ইবনে তাইমিয়্যাহ বহু কীর্তিত গ্রীক যুক্তিবাদের সমালোচনায়ও অবতীর্ণ হয়েছেন পূর্ণ সাহসিকতা ও আত্মপ্রত্যয়ের সাথে। যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে কিছু মৌলিক আপত্তি উত্থাপন ও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং একজন মুজতাহিদের দৃষ্টিতে গোটা শাস্ত্রের আগাগোড়া বিচার বিশ্লেষণ ও বিশদ সমালোচনা পর্যালোচনার ঐতিহাসিক দায়িত্বও তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছিলেন। শাস্ত্রের বহু স্বীকৃত উসুল ও সূত্রের ভ্রান্তি প্রমাণকল্পে তিনি নিরেট শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত যুক্তিনির্ভর ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সংজ্ঞার খুঁত ও দুর্বলতা তুলে ধরে নিখুঁত ও সর্বাঙ্গীণ বিকল্প সংজ্ঞা পেশ করেছেন। মোটকথা, গ্রীক দর্শন ও যুক্তিশাস্ত্রে ইবনে তাইমিয়্যাহ’র ইজতিহাদ, স্বাধীন সমালোচনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনা ইতিহাসের গতিপথে নিঃসন্দেহে একটি মাইলফলকের মর্যাদা লাভ করেছে এবং ইজতিহাদ ও গবেষণার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

কালামশাস্ত্রবিদদের সমালোচনায়ও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। কেননা এই ভদ্রলোকেরা ইসলামের আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন সত্য, কিন্তু গায়েবী বিষয়গুলো প্রমাণ করতে গিয়ে তারা দার্শনিকদের প্রমাণ পদ্ধতি এবং দর্শনের সীমাবদ্ধ ভ্রান্তিপূর্ণ পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন, অথচ সেগুলোর স্বতন্ত্র আবেদন ও প্রভাব, অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। তিনি বলেন, “সৃষ্টিতত্ত্ব, স্রষ্টার অস্তিত্ব ও পুনরুত্থানের সততা প্রমাণের ক্ষেত্রে কালামশাস্ত্রবিদদের বক্তব্য আকল ও যুক্তির বিচারে যেমন সারগর্ভ ও সন্তোষজনক নয়, তেমনি (কুরআন- সুন্নাহ’র) নকল ও উক্তিগত দিক থেকেও প্রামাণ্য নয়। (অর্থাৎ, আকল ও নকল, তথা যুক্তি ও উক্তি কোন বিচারেই তা মনোত্তীর্ণ নয়।) তারা নিজেরাও এ সত্য স্বীকার করে থাকেন। ইমাম রাযি শেষ জীবনে পরিস্কার বলেছেনঃ দর্শন ও কালামশাস্ত্রের প্রমানীকরন পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে তাতে রোগের আরোগ্য নেই এবং পিপাসা নিবারণেরও ব্যবস্থা নেই। পক্ষান্তরে কুরআন- সুন্নাহ’র পক্ষকেই আমি নিরাপদ ও নিকটতম পথরূপে পেয়েছি। ……আমার মতো যে কেউ পরীক্ষা- নিরীক্ষা চালাবে তাকে এ সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে হবে। গাযালি ও ইবনে আকিল প্রায় অভিন্ন কথাই বলেছেন আর এটিই হল সত্য।”

সত্যের ঝান্ডা তুলে ধরে এগিয়ে যেতে গিয়ে ইবনে তাইমিয়্যাহকে কিছু হিংসুটে ব্যক্তির কারনে কয়েকবার কারাগারে যেতে হয়। ৭২৬ হিজরিতে শেষবারের মতো কারাগারে প্রেরণ করা হলে তার বিরোধী ও হিংসুটে লোকেরা এ সময় তার বন্ধু ও শাগরিদদের উপর আক্রমণ চালায়। ইবনে তাইমিয়্যাহকে কারাগারে প্রেরণ করার ঘটনায় সাধারণ মুসলিম আর হাজার হাজার আলিম শোকাতর হয়ে পড়ে এবং প্রবৃত্তিপূজারী, বিদআতি ও ধর্মদ্রোহীরা আনন্দে উল্লসিত হয়ে পড়ে।

দীর্ঘকাল পর কারাগার জীবনে ইবনে তাইমিয়্যাহ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলতে ও একাগ্রতারূপ মহাসম্পদ লাভে সক্ষম হোন। সম্ভবত কারাগারে আবারও আসার খবর জানতে পেরে তিনি এর প্রতিই লক্ষ্য করে বলেছিলেন - “এর ভেতর প্রচুর কল্যাণ আর বিরাট স্বার্থ রয়েছে।” তিনি এই নির্জন ও নিঃসঙ্গ জীবনের পরিপূর্ণ মর্যাদা দান করেন এবং পরিপূর্ণ আত্মনিমগ্নতা ও গভীর আগ্রহ সহকারে ইবাদাত ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়েন। এই অবকাশ জীবনে তার সবচেয়ে বড় নেশা ছিল কুরআন তিলাওয়াত। দুই বছরের এই বন্দী জীবনে তিনি তার ভাই শায়খ জয়নুদ্দিন ইবনে তাইমিয়্যাহ’র সাথে ৮০ বার কুরআন তিলাওয়াত খতম করেন। কুরআন তিলাওয়াতের পর হাতে যা কিছু সময় থাকতো

তা তিনি অধ্যয়ন, কিতাব রচনা আর নিজের কিতাবের সংশোধন ও পরিমার্জনের কাজে ব্যয় করতেন। কারাগারে তিনি যা কিছু লিখেছিলেন তার বেশিরভাগই ছিল তাফসীর সম্পর্কিত। এর কারনও ছিল সম্ভবত কুরআন তিলাওয়াতের আধিক্য ও কুরআন গভীর অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন। কতিপয় মাসআলা বিষয়ে তিনি পুস্তিকা ও উত্তরপত্র লিখেন। বাইরে থেকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ তত্ত্বগত প্রশ্নাদি ও ফিকহি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ চেয়ে পাঠানো হতো তিনি তার জওয়াব দিতেন। কারাগারে বসে তিনি যা কিছু লিখতেন লোকে তা হাতে হাতে লুফে নিতো আর তা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে যেতো।

কারাগারের ভেতর তার রচিত একটি পুস্তিকা ছিল যিয়ারতের মাসআলা সম্পর্কিত, যেটিতে তিনি মিসরের আবদুল্লাহ ইবনুল আখনাঈ নামের এক মালিকী মাযহাবের কাযিকে প্রত্যাখ্যান করেন। সেই কাযির মূর্খতা এতে প্রমাণিত হয়ে গেলে সেই কাযি সুলতানের কাছে ইবনে তাইমিয়্যাহ’র বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এর ফলে সুলতানের আদেশে শাইখের কাছ থেকে লেখাপড়ার সকল উপকরণ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে সময় তার কাছ থেকে তার সমস্ত পাণ্ডুলিপি ও লিখিত পৃষ্ঠা কারাগার থেকে নিয়ে আদিলিয়ার বড় লাইব্রেরীতে রাখা হয়। এসব কিতাবের পরিমাণ ছিল ৬০ খন্ডের। কিন্তু ইবনে তাইমিয়্যাহ এরপরেও থেমে থাকেননি, তিনি বিচ্ছিন্ন ও টুকরো কাগজ কুড়িয়ে জমা করে সেগুলোর উপর কয়লা দিয়ে লিখতে শুরু করলেন। পরবর্তীকালে এভাবে লিখিত তার কয়েকটি পুস্তিকাও পাওয়া গিয়েছে।

তার ছাত্রঃ

ইবনে তাইমিয়্যাহ তার যৌবন থেকেই শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন আর দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত তিনি শিক্ষা দান করেন। এ সময়ে অসংখ্য ছাত্র তার থেকে দ্বীনের ইলম হাসিল করেন। তার উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন হলেনঃ ইবনুল কায়্যিম, ইবনে কাসির, আয- যাহাবি, ইবনে কুদামাহ আল- মাকদিসি, ইবনে মুফলিহ আল- হানবালি, আবু মুহাম্মাদ আল- কাসিম আল- বারযালি, আল- বাযযার, ইবনে আবদুল হাদি, উমার আল- হাররানি প্রমুখ।

ইবনে হাযার বলেন, “যদি শাইখ ইবনে তাইমিয়্যাহ’র ইবনুল কায়্যিমের মতো একজন ছাত্র ছাড়া আর কোন অর্জন না- ও থাকতো, যিনি বহুল প্রচারিত কিতাবসমূহের রচনা করেছেন যেগুলো থেকে তার সাথে ঐকমত আর মতানৈক্য পোষণকারী উভয়ই উপকৃত হয়, তবে এটিই শাইখের মহান মর্যাদা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট হতো।”

তার কর্মঃ

কুরআন- সুন্নাহ’র সুগভীর জ্ঞান, শরীয়তের ভাব ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতনতা এবং ফিকহ ও ইজতিহাদের অঙ্গনে পাণ্ডিত্য ও বৈদগ্ধের ছাপ তার প্রতিটি লেখা ও রচনায় ছিল সুস্পষ্ট। ইবনে তাইমিয়্যাহ তাফসীর শাস্ত্রকে তার রচনা ও গবেষণা জীবনের বিশেষ বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তার ছাত্রদের বর্ণনা মতে, তিনি ৩০ খন্ডেরও বেশী এক সুবিশাল তাফসীর কিতাব রচনা করেছিলেন। এই বিস্তৃত ও ধারাবাহিক তাফসীর কিতাবটি বিলুপ্ত হয়ে গেলেও বিভিন্ন সূরার খন্ডিত তাফসীর ইতিমধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাফসীর কিতাবগুলো হল – তাফসীরু সুরাতিল ইখলাস, তাফসীরু মু’আওয়াযাতাইন, তাফসীরু সুরাতিন নূর। এছাড়া তার রচনা সমগ্র থেকে তাফসীর বিষয়ক অংশগুলো তাফসিরু ইবনে তাইমিয়্যাহ নামে ৭ খন্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

তার রচিত বিপুল সংখ্যক অন্যান্য কিতাবসমূহের মধ্যে কয়েকটি কিতাব হল – মাজমু' ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়্যাহ (৩৭ খন্ড), ফাতওয়া আল- কুবরা (৫ খন্ড), আকিদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ, আকিদাতুল হামাওিয়্যাহ, দার তা'আরুদ আল- 'আকল ওয়ান নাকল (১২ খন্ড), মিনহাজুস সুন্নাহ আন নাবাওিয়্যাহ (৬ খন্ড), আল- জাওাব আস- সাহিহ লিমান বাদ্দালা দ্বীন আল- মাসিহ (৬ খন্ড), আস- ইস্তিকামাহ, আল- কাওাইদ আন- নুরানিয়্যাহ আল- ফিকহিয়্যাহ, কা'ইদাহ আযিমাহ ফিল ফারাক বাইন 'ইবাদাহ আহল আল- ইসলাম ওয়াল ঈমান ওয়া 'ইবাদাহ আহল আশ- শিরক ওয়ান- নিফাক ইত্যাদি।

তার উক্তিঃ

"আল্লাহ'র পক্ষ থেকে প্রতিটি শাস্তিই হল একদম খাঁটি সুবিচার এবং প্রতিটি দয়াই হল খাঁটি অনুগ্রহ।"

"সত্যিকারের কারারুদ্ধ ব্যক্তি তো সে, যার অন্তর আল্লাহ্‌কে স্মরণের ব্যাপারে কারারুদ্ধ; আর সত্যিকারের আটক ব্যক্তি তো সে- ই, যার কামনা- বাসনা তাকে এর ক্রীতদাস বানিয়েছে।"

"এই গোটা দ্বীনের কেন্দ্রই হল সত্যকে জেনে এর উপর আমল করার উপর, আর আমল অবশ্যই সবরের সাথে হতে হবে।"

"আপনি যদি আপনার অন্তরে আমলের মধুরতা অনুভব না করেন তবে সে আমলের ব্যাপারে সন্দেহ করুন, কারন মহিমান্বিত রব তো সবই বুঝতে পারেন।"

"গোলাম তার মালিককে যতই ভালবাসে ততই তার অন্য কিছুর প্রতি ভালোবাসা আর সেগুলোর (অর্থাৎ, ভালোবাসার অন্যান্য বিষয়বস্তুগুলোর) সংখ্যা কমে যায়। আর গোলাম তার মালিককে যত কম ভালবাসে, ততই অন্য কিছুর প্রতি ভালোবাসা আর সেগুলোর সংখ্যা বেড়ে যায়।"

"গোলামের তো সবসময়ই হয় আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কোন দয়ার কারনে সেটির প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, অথবা পাপের ফলে অপরাধী হওয়ার কারনে আল্লাহ'র কাছে তাওবা করে ফিরে যাওয়া উচিত; এভাবে সে আল্লাহ'র এক দয়া থেকে আরেক দয়ার দিকে চলতে থাকে এবং তার তো সবসময়ই তাওবার প্রয়োজন রয়েছে।"

"পাপ হচ্ছে ক্ষতির কারন, আর তাওবা সেই কারণকে দূর করে দেয়।"

"তাওহীদের প্রতি সাক্ষ্য বহন করা কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করে দেয় এবং পাপ থেকে তাওবা করাটা অমঙ্গলের দরজা বন্ধ করে দেয়।"

"অন্তরের বিরুদ্ধে জিহাদ হল কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদের ভিত্তি।"

"কোন ব্যক্তির অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত না হলে সে কখনোই আল্লাহ'র পাশাপাশি অন্য কাউকে ভয় করবে না।"

"তাওহীদের পরিপূর্ণতা তো তখনই হয় যখন অন্তরে এগুলো ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না – আল্লাহ, তিনি যাদের আর যেগুলো ভালোবাসেন তাদেরকে আর সেগুলোকে ভালোবাসা, এবং তিনি যাদের আর যেগুলোকে ঘৃণা করেন তাদেরকে আর সেগুলোকে ঘৃণা করা, যাদের ব্যাপারে তিনি আনুগত্য করতে বলেছেন তাদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন

করা, যাদের প্রতি তিনি শক্রুতা প্রদর্শন করেছেন তাদের প্রতি শক্রুতা প্রদর্শন করা, তিনি যা করতে আদেশ করেছেন তা করতে আদেশ করা এবং যা করতে নিষেধ করেছেন তা করতে নিষেধ করা।"

"এই দুনিয়াতে একজন ব্যক্তি আল্লাহর স্মরণে, তার প্রশংসায় আর তার ইবাদাতে এমন এক আনন্দ পায় যেটির সাথে কোন কিছুরই তুলনা হয় না।"

"যুহদের উদ্দেশ্য হল এমনসব কিছু পরিত্যাগ করা যা পরকালে গোলামের ক্ষতি করবে, আর ইবাদাতের উদ্দেশ্য হল এমন সব কাজ করা যা পরকালে তার উপকার করবে।"

"পাপসমূহ হল শিকল ও তালার ন্যায়, যা পাপকর্ম সম্পাদনকারীদেরকে তাওহীদের সুবিশাল বাগানে বিচরণ করা থেকে আর সৎকর্মসমূহের ফসলগুলোকে কাটতে বাধা দেয়।"

"কি করতে পারবে আমার শক্রুরা ? আমার অন্তরেই তো রয়েছে আমার জান্নাত, আমি যেখানেই যাই সেটি আমার সাথেই থাকে। আমাকে কারারুদ্ধ করা হলে সেটি হবে আমার রবের সাথে একাকী সঙ্গ লাভের একটি সুযোগ। আমাকে হত্যা করা হলে তো শাহাদাত লাভ করবো আর আমার ভূমি থেকে আমাকে নির্বাসিত করা হলে সেটি হবে এক আধ্যাত্মিক সফর।"

তার মৃত্যুঃ

ইবনে তাইমিয়্যাহ কারারুদ্ধ অবস্থাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে দামেশকের শাসনকর্তা তার কাছে রোগ পরিচর্যার উদ্দেশ্যে গমন করেন আর তাকে বলেন, "আমার দ্বারা কোন ত্রুটি বিচ্যুতি হলে বা কষ্ট পেয়ে থাকলে আল্লাহ'র ওয়াস্তে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।" জবাবে ইবনে তাইমিয়্যাহ বললেন, "আমি আমার পক্ষ থেকে আপনাকে ক্ষমা করেছি আর তাদেরকেও ক্ষমা করেছি যারা আমার সাথে শক্রুতা করেছে। আর আমি যে সত্যের উপর আছি তা তারা জানে না। সুলতান মু'আজ্জাম আল- মালিকুন নাসির আমাকে বন্দী করেছিলেন বলে তার বিরুদ্ধেও আমার কোন অভিযোগ নেই। কেননা তিনি নিজে থেকে এ কাজ করেননি, বরং উলামায়ে কেরামগনের প্রতি আস্থা ও আনুগত্যের কারনে করেছেন। তাই আমি তাকে মাযুর মনে করি। আমার পক্ষ থেকে আমি আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দুশমন ছাড়া সবাইকেই মাফ করেছি।"

বেশ কিছুদিন শরীর অসুস্থ থাকার পর তিনি কারারুদ্ধ অবস্থায় ৭২৮ হিজরি সনের ২০শে যুলকাদাহ রাতে ইন্তিকাল করেন। মুওাযযিন দুর্গের মিনারে চড়ে শায়খুল ইসলামের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করেন, এরপর বুরুজে মোতায়েন পাহারারত চৌকিদার সেখান থেকে সেই ঘোষণার পুনরাবৃত্তি করে, মসজিদগুলো থেকেও ছড়িয়ে পড়ে এ শোকবার্তা, বিদ্যুৎ বেগে ছড়িয়ে পড়ে তার মৃত্যু সংবাদ। মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যায় শহরের সব আনন্দ কোলাহল, শোকের ছায়া নেমে আসে সর্বত্র। দুর্গের দরজা খুলে দিয়ে সর্বসাধারণকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। দলে দলে লোকজন আসতে থাকে শায়খুল ইসলামকে এক নজর দেখার জন্য।

মৃতদেহকে গোসল দেওয়ার পরে তার প্রথম জানাযা দুর্গের ভেতর অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তা শহরের বৃহত্তম মসজিদ (এটি তৎকালীন ইসলামী বিশ্বের বৃহত্তম জামে মসজিদও ছিল) জামে উমুবিতে আনা হয়। দুর্গ ও জামে উমুবির মধ্যকার দীর্ঘ রাজপথ লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। এ মসজিদ ভরে গিয়ে সামনের ময়দান, রাজপথ, আশেপাশের অলি- গলি, বাজার

সবই লোকে ভরে যায়। ভিড়ের চাপ এতো বেশী ছিল যে সৈন্যদেরকে কফিন ঘিরে রাখতে হয়, অন্যথায় জানাযার হেফাযত ও ইন্তিজাম করা ছিল সত্যিই কঠিন। ঐতিহাসিকদের মতে ইতিপূর্বে ইসলামী বিশ্বের আর কোথাও এতো বড় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়নি।

ইবনে কাসির বলেন, “তার জানাযার সামনে, পিছে, ডানে বামে বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি অবস্থান করছিলেন। তাদের সংখ্যা একমাত্র আল্লাহই গণনা করতে পারেন। কোন এক ব্যক্তি চিৎকার করে বললেন, ‘সুন্নাতের ইমামের জানাযা তো এমনই হয়’, এটি শোনার পর লোকেরা কাঁদা শুরু করলো।”

ফজরের পর জানাযা বের হয়েছিলো, যোহরের পর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয় আর ভিড় ঠেলে নিকটবর্তী কবরস্থান আস-সুফিয়াতে পৌঁছতে আসরের ওয়াক্ত হয়ে পড়ে। অতি অল্প সময়ে শায়খের মৃত্যু সংবাদ পুরো ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম ইবনে রজব বলেন, “নিকটবর্তী ও দূরবর্তী দেশগুলোতে ইমামের গায়েবানা জানাযা পড়া হয়, এমনকি ইয়ামান ও সুদুর চীনেও তার গায়েবানা জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। ভ্রমণকারীরা বর্ণনা করেছেন যে চীনের একটি দূরবর্তী শহরে জুমু’আর দিন গায়েবানা জানাযার ঘোষণা এভাবে দেওয়া হয়েছিলো – ‘কুরআনুল কারীমের মুখপাত্রের জানাযা হবে।’ ”

মহান আল্লাহ ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) কে ক্ষমা করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস প্রদান করুন, আমীন।

অন্তরের ব্যাধিসমূহ ও তাদের চিকিৎসা

অন্তর তিন ধরনের হয়ে থাকে –

(১) বিশুদ্ধ অন্তর, এটি আল্লাহ'র আদেশ- নিষেধ বিরোধী সব কামনা- বাসনা থেকে নিরাপদ এবং তিনি যা জানিয়ে দিয়েছেন সেগুলোর বিপরীত সকল সংশয়- সন্দেহ থেকেও নিরাপদ; যেমনিভাবে এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করা এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি থেকে বিচার- মীমাংসা চাওয়া থেকেও নিরাপদ।

(২) মৃত অন্তর, এটি বিশুদ্ধ অন্তরের বিপরীত যেটির কোন প্রাণ নেই; এটি না জানে তার রবকে আর না তার ইবাদাত করে।

(৩) এমন এক অন্তর, যেটিতে কিছু জীবনীশক্তি আছে কিন্তু একটি ক্রুটিও আছে। সুতরাং এই অন্তরে আল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসা, তার প্রতি ঈমান, ইখলাস আর তাওয়াক্কুল থাকে; এগুলো অন্তরের জীবিত থাকার জন্য অপরিহার্য বিষয়। এই অন্তরে নিরর্থক ও অসার কামনা- বাসনার প্রতি ভালোবাসা আর এগুলোর প্রতি অগ্রাধিকারও থাকে, আরো থাকে ঘৃণ্য নীতি ও আচার- আচরণ; এগুলোর কারনে অন্তর মৃত হয়ে পড়ে। এই অন্তরটি জীবিত ও মৃত - এ দুটো অবস্থার মধ্যে ক্রমাগত দুলতে থাকে।

সুতরাং প্রথম প্রকারের অন্তর হল জীবিত, নম্র, কোমল ও ভদ্র অন্তর। দ্বিতীয় প্রকারের অন্তরটি শুকিয়ে যাওয়া, কঠিন ও মৃত অন্তর। তৃতীয় প্রকারের অন্তর হল ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর, একে নিরাপদও করা যেতে পারে অথবা এর ধ্বংসও মোহরাঙ্কিত হয়ে যেতে পারে।

অন্তরের সকল ব্যাধিই কামনা- বাসনা আর সন্দেহ- সংশয়ের উপর গড়ে উঠে। অন্তরের জীবনীশক্তি ও এর প্রদীপ্তি এর সকল কল্যাণের কারন, আর এর মৃত্যু ও অন্ধকারময়তা এর সকল পাপ ও অমঙ্গলের কারন।

সত্য সম্পর্কে জানা, একে ভালোবাসা আর অন্য যেকোন কিছুর উপর একে অগ্রাধিকার দেওয়া ছাড়া অন্তর কখনোই জীবিত ও পরিশুদ্ধ হবে না। অন্তরের জন্য কোন সুখ- আনন্দ বা সংশোধন নেই, যদি না এটি আল্লাহ'র ইবাদাত করাকে এর একমাত্র লক্ষ্য- উদ্দেশ্যে পরিণত করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহ্‌কেই কামনা করে।

অন্তরের পরিশুদ্ধি, তাওবা করা, সব ধরনের মিথ্যা ভালোবাসা আর ঘৃণ্য আচার- আচরণ বর্জন করা ছাড়া অন্তর কখনোই যথাযথ হবে না। পাপের প্রতি উৎসাহিত করা অন্তরের বিরুদ্ধে জিহাদ করা আর একে হিসাবনিকাশের সম্মুখীন করা, জীন জাতির অন্তর্ভুক্ত শয়তানদের চক্রান্ত ও লক্ষ্য- উদ্দেশ্য জেনে আল্লাহ্‌কে আঁকড়িয়ে ধরে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং মহিমান্বিত আল্লাহ'র স্মরণ করার মাধ্যমে আর তাদের থেকে আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করা – এগুলো করা ছাড়া এটি কখনোই অর্জিত হবে না। [১১]

দুটি মৌলিক বিষয়ের উপর কেন্দ্র করে অন্তর ক্রুটিপূর্ণ ও দুর্বল হয়ে যায়, এগুলো হলো - ইলমের বিকৃতি ও নিয়্যতের বিকৃতি। এগুলো দুটো ধ্বংসাত্মক ব্যাধি - ক্রোধ ও পথভ্রষ্টতার দিকে পালাক্রমে পরিচালিত করে। পথভ্রষ্টতা হল

নিয়্যতের বিকৃতির শেষ পরিনাম। সুতরাং এই দুটো ব্যাধিই হল অন্তরকে দুর্দশাগ্রস্তকারী সকল ব্যাধির রাজা। এর চিকিৎসা নির্ভর করে ইলমের উপর ভিত্তি করা হিদায়াতের (পথনির্দেশনা) উপর। ইলমের উপর ভিত্তি করা হিদায়াত হল সত্যকে জানা আর সেটির অনুসরণ করা। পুরো কুরআনই হল এই দুটো ব্যাধিসহ অন্যান্য সকল ব্যাধির চিকিৎসা আর কুরআনই পরিপূর্ণ হিদায়াত ধারণ করে। [১২]

চিকিৎসা সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াত

মহান আল্লাহ বলেন,

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (١٤)

“...এবং তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহের চিকিৎসা করবেন।” (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৪)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (٨٠)

“এবং যখন আমি অসুস্থ হই, তিনি আমার চিকিৎসা করেন।” (সূরা শু’আরা, ২৬ : ৮০)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

“হে মানবজাতি, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে, আর এসেছে অন্তরসমূহের সকল রোগের একটি চিকিৎসা, এবং (এটি) মুমিনদের জন্য হিদায়াত (পথপ্রদর্শক) ও রহমত।” (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)

“এবং আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য একটি চিকিৎসা ও রহমত...” (সূরা ইসরা’, ১৭ : ৮২)

هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۖ

“এটি (কুরআন) আল্লাহ’র বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য হিদায়াত আর একটি চিকিৎসা।” (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৪)

يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ ۗ

"তাদের উদর থেকে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয় (মধু), যাতে মানুষের জন্য রয়েছে একটি চিকিৎসা।" (সূরা নাহল, ১৬ : ৬৯)

প্রথম অধ্যায়

অন্তরের ব্যাধিসমূহ ও তাদের চিকিৎসা

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহ’র জন্যই, আমরা তারই সাহায্য চাই আর ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তার নিকট আশ্রয় চাই আমাদের আত্মা ও আমলের অনিস্টতা থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন কেউই তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন কেউই তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য কোন ইলাহ নেই, তার কোন শরীক নেই। আর আমি এটিও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) তার গোলাম ও রসূল।

গৌরবান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন,

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ

“তাদের অন্তরে একটি ব্যাধি রয়েছে, আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।” (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০)

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٣)

“এটি এই জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে সেটা তিনি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেন, যাদের অন্তরে রয়েছে একটি ব্যাধি আর যাদের অন্তর কঠিন।” (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫৩)

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)

“মুনাফিকেরা আর যাদের অন্তরে একটি ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করবো। এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা অল্প সময়ই থাকবে।” (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬০)

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ

"…এবং বিশ্বাসীরা আর কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে একটি ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে, 'আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন ?' " (সূরা আল- মুদদাসসির, ৭৪ : ৩১)

আল্লাহ আরও বলেন [১৩],

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (٥٧)

"হে মানবজাতি, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে উপদেশ এসেছে, আর (এটি) তোমাদের অন্তরসমূহে যা রয়েছে তার জন্য একটি চিকিৎসা, এবং (এটি) মুমিনদের জন্য হিদায়াত (পথপ্রদর্শক) ও রহমত।" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৫৭)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۙ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (٨٢)

"এবং আমরা কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনদের জন্য একটি চিকিৎসা ও রহমত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" (সূরা ইসরা', ১৭ : ৮২)

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّـهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)

"…এবং তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহের চিকিৎসা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্রোধ দূর করে দিবেন, আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, এবং আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৪- ১৫)

শরীরের অসুস্থতা হল এর সুস্থ- সবল থাকার বিপরীত, এটি হল একটি অধঃপতন যা এতে ঘটার কারনে এর উপলব্ধি করার স্বাভাবিক অনুভূতি আর নড়চড় করার অকৃতকার্যতা দেখা দেয়।

এটির উপলব্ধি সম্পর্কে বলা যায়, হয় এটি সম্পূর্ণভাবেই চলে যায়, যেমন অন্ধত্ব বা বধিরতা; অথবা এটি কোন কিছুর অনুভুতিকে ভুলভাবে অনুভব করে, যেমন মিষ্টি কোন কিছুকে তেতো হিসেবে অনুভব করে বা এমন অলীক কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, বাস্তব দুনিয়াতে যেটির কোন বাস্তবতাই নেই।

আর এটির অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ নড়চড় করার অকৃতকার্যতার ক্ষেত্রে উদাহারন হল খাবার হজমে অক্ষমতা বা শরীরের জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রতি রুচি না থাকা বা এমন কিছুর প্রতি কামনা করা যা একে দুর্বল করবে; এগুলোর ফলে অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করবে, তবে মৃত্যু বা শারীরিক ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করবে না। এর পরিবর্তে ভুল পরিমানে কিছু খেলে বা ভুল উপায়ে শরীরে কিছু প্রয়োগ করলে এই অকৃতকার্যতাগুলো মূল শরীরকেই পীড়ার দিকে পরিচালিত করবে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে এটি হতে পারে যে, হয় খুবই অল্প পরিমান খাবার গ্রহণের কারনে শরীরের আরও অধিক পরিমান খাবারের প্রয়োজন হয়, অথবা খুব বেশী পরিমান খাবার গ্রহণের কারনে শরীরের সেগুলো বের করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। আর দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে, ঔষধের ভুল ব্যবহারের কারনে শরীরে তাপমাত্রা অত্যন্ত বেশী বা কম হয়ে যাওয়ার মত কিছু ঘটতে পারে।

একই বিষয় অন্তরের ব্যাধির জন্যও সত্য, কারন এটিও এক ধরনের অধঃপতন যা এতে ঘটে এবং এর উপলব্ধি ও কামনা- বাসনার অকৃতকার্যতা ঘটায়। সুতরাং এটির উপলব্ধি সম্পর্কে বলা যায়, এটি অধঃপতিত হয় সন্দেহর উপর সন্দেহ দিয়ে উপস্থাপিত এর অস্তিত্ব দ্বারা, যতক্ষণ পর্যন্ত তা সত্য দেখতে না পায় অথবা ভুলভাবে সত্যকে বুঝে নেয়। সত্যকে ঘৃণা করা দ্বারা এটির কামনা- বাসনা অধঃপতিত হয় আর মিথ্যাকে ভালোবাসার দ্বারা যা এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারনেই "ব্যাধি" কে কখনো কখনো সন্দেহ- সংশয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়, যেমনটা এই আয়াতের তাফসীরে ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহিদ ও কাতাদাহ –

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّـهُ مَرَضًا ۖ

"তাদের অন্তরে রয়েছে একটি ব্যাধি আর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০)

এবং অন্য সময় ব্যাভিচার করার জন্য কামনা করা, যেমনটা এই আয়াতে বলা হয়েছে –

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٢)

"... যাতে যার অন্তরে একটি ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়।" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২)

এ কারনেই আল- খারা'ইতি "অন্তরের দুর্বলতা ও এর ব্যাধিসমূহের অর্থ" নামক একটি কিতাব রচনা করেছিলেন, এখানে 'ব্যাধিসমূহ' বলতে বুঝানো হয়েছে কামনা- বাসনার ব্যাধিকে।

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি এমন কিছু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেটি দ্বারা সুস্থ ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, যেমন - খুবই অল্প উষ্ণতা, অল্প ঠাণ্ডা, অল্প পরিশ্রম বা অনুরূপ কিছু দ্বারা; দুর্বল অবস্থায় এগুলোকে সহ্য করার অক্ষমতার কারনে এগুলো তার ক্ষতি করে। সাধারণত পীড়িত ব্যক্তিকে অসুস্থতা দুর্বল করে দেয় তার সহনশীলতা দুর্বল করে দেওয়ার মাধ্যমে আর সে তার সবল অবস্থায় যা সহ্য করতে পারে সে সহ্যক্ষমতা অক্ষম করে দেয়। সুতরাং সুস্থ অবস্থা সংরক্ষিত থাকে সুস্থ থাকার মাধ্যমে আর এটি দূর হয় এর বিপরীত অবস্থার দ্বারা। অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করা প্রারম্ভিক অবস্থার অনুরূপ কোন অবস্থার উপস্থিতি দ্বারা অসুস্থতা আরও তীব্র হয়ে পড়ে আর তা দূর হয় এর বিপরীত দ্বারা।

এ কারনে যদি একজন অসুস্থ ব্যক্তি তাকে শুরুতে অসুস্থতার দিকে পরিচালিত করেছে এমন কিছু দ্বারা নিপীড়িত হয়, তবে তার ব্যাধি বৃদ্ধি পায় আর তার সহনশীলতা অধিকতর দুর্বল হয়ে যায়, হয়তো (এটি হতে পারে) তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত। কিন্তু সে যদি এমন কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয় যা তার শক্তি বৃদ্ধি করবে আর ব্যাধি দুর্বল করবে, তবে বিপরীত ঘটনা ঘটবে।

অন্তরের ব্যাধি হল একটি যন্ত্রণা যা অন্তরে ঘটে, যেমন - আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আপনাকে পরাজিত করার ফলে তার প্রতি আপনার ক্রোধ অনুভব হয়, কারন এটি অন্তরকে আহত করে। আল্লাহ বলেন,

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ اللَّـهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥)

"...এবং তিনি মুমিনদের অন্তরসমূহের চিকিৎসা করবেন। আর তাদের অন্তরসমূহের ক্রোধ দূর করে দিবেন, আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, এবং আল্লাহ তো সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১৪- ১৫)

সুতরাং তাদের চিকিৎসা করা হল তাদের অন্তরের পীড়া দূর করার মাধ্যমে।

বলা হয়ে থাকে, "অমুক ব্যক্তি তার ক্রোধের চিকিৎসা করলো।" প্রতিশোধের ক্ষেত্রে বলা হয়, "নিহতের নিকট আত্মীয় চিকিৎসা চাইলো।" - অর্থাৎ তাদের শোক, দুঃখ, ক্রোধের চিকিৎসা - এগুলোর সবই হল ব্যক্তির ভিতর ঘটিত পীড়া। অনুরুপভাবে, সন্দেহ ও অজ্ঞতা হল অন্তরের কষ্টের কারন।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যদি তারা না জানে তবে কি তারা জিজ্ঞেস করবে না ? নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা।" [১৪]

আর যে ব্যক্তি আচার- পদ্ধতি পরিবর্তন করতে পারে এমন কোন বিশ্বাস বা মতকে বুঝে গ্রহণ করে এতে সন্দেহ পোষণ করে, এটি তার অন্তরের ক্ষতির কারন হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ইলম ও দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করে। তাই সুস্পষ্টভাবে সত্য জবাব দেওয়ার পর এক আলিমকে বলা হলো, "আপনি জবাব দেওয়ার মাধ্যমে আমার চিকিৎসা করলেন।"

১.১ অসুস্থতা ও মৃত্যুর মাঝে

অন্তরের অসুস্থতা হল এর মৃত্যুর থেকেও নিকৃষ্টতর স্তর। অন্তর মারা যায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতার কারনে, কিন্তু তা অসুস্থ হয়ে পড়ে খণ্ড খণ্ড অজ্ঞতার কারনে। এক্ষেত্রে অন্তর মারা যেতে পারে, অসুস্থ হতে পারে অথবা চিকিৎসার দ্বারা রোগমুক্তিও লাভ করতে পারে।

অন্তরের জীবন, মৃত্যু, অসুস্থতা ও চিকিৎসা হল শারীরিক জীবন, মৃত্যু, অসুস্থতা ও চিকিৎসা থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ কারনেই সংশয়- সন্দেহ আর কামনা- বাসনার উপস্থিতির ফলে অন্তর অসুস্থ হয়ে পড়ে অথবা অসুস্থতা তীব্রতর হয়। যদি অন্তরে হিকমত ও সদুপদেশ ঘটে তবে এগুলো অন্তরকে এর সংশোধন ও চিকিৎসার পথে পরিচালিত করে। মহান আল্লাহ বলেন,

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٣)

"এটি এই জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে সেটা তিনি তাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ করেন, যাদের অন্তরে একটি ব্যাধি রয়েছে আর যাদের অন্তর কঠিন।" (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫৩)

কারন এটি তাদের মধ্যে সন্দেহ জন্ম দেয় ও তাদের অসারতার কারনে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে যায় আর সন্দেহ দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ঈমান থেকে দূরে সরে যায়। এ কারনে শয়তান তাদের প্রতি যা নিক্ষেপ করে তা তাদের জন্য ফিতনায় পরিণত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)

"মুনাফিকেরা আর যাদের অন্তরে একটি ব্যাধি আছে আর যারা নগরে গুজব রটনা করে, তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে প্রবল করবো। এরপর এই নগরীতে তোমার প্রতিবেশী রূপে তারা অল্প সময়ই থাকবে।" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬০)

وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ

"… এবং বিশ্বাসীরা আর কিতাবীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে একটি ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে, 'আল্লাহ এই অভিনব উক্তি দিয়ে কি বুঝাতে চেয়েছেন ?' " (সূরা আল- মুদদাসসির, ৭৪ : ৩১)

এই লোকগুলোর (কঠিন হয়ে যাওয়া) অন্তর মারা যায় নি, যেমনটি কাফির ও মুনাফিকদের ক্ষেত্রে ঘটেছিলো; আর তাদের অন্তরগুলো মুমিনদের পবিত্র অন্তরের ন্যায় বিশুদ্ধ ও পবিত্র নয়, বরং তাদের অন্তরগুলোতে সংশয়- সন্দেহ আর কামনা- বাসনার অসুস্থতা রয়েছে। অনুরূপ তার ক্ষেত্রেও, যার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٢)

"…যাতে যার অন্তরে একটি ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয় …" (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২)

এখানে কামনা- বাসনার অসুস্থতাকে নির্দেশ করা হয়েছে, কারন বিশুদ্ধ অন্তর যদি কোন নারী কতৃক প্রলুব্ধ হয় তবে তার প্রতি নত হবে না। অপরদিকে, কামনা- বাসনার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত অন্তর তার দুর্বলতার কারনে তার অসুস্থতার প্রবলতা বা দুর্বলতা অনুযায়ী সেটি যা দ্বারা প্রলুব্ধ হয়েছে তার প্রতি নত হয়ে যাবে, আর এটি যখন প্রলোভনের প্রতি আত্মসমর্পণ করবে তখন অন্তরের ব্যাধি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হবে।

১.২ অন্তরের একটি চিকিৎসা হল আল- কুরআন

অন্তরে যা রয়েছে তার চিকিৎসা হল আল- কুরআন। যে ব্যক্তির অন্তরে সন্দেহ ও কামনা- বাসনার অসুস্থতা রয়েছে কুরআন তার জন্যও চিকিৎসা, কারন এতে রয়েছে পরিস্কার প্রমাণাদি যা বাতিল থেকে হকের পার্থক্য নির্দেশ করে আর মিথ্যা সংশয়- সন্দেহের অসুস্থতাকে অন্তর থেকে দূর করে দিয়ে সুনিশ্চিত জ্ঞান, সঠিক উপলব্ধি ও বোধশক্তিকে এমনভাবে অন্তরে স্থান করে দেয় যে অন্তর কোন বিষয় বা ঘটনাকে তাদের বাস্তবতা অনুযায়ী প্রত্যক্ষ করে।

কুরআনে রয়েছে হিকমত, রয়েছে চমৎকার উপদেশ যা সৎ কাজ করার ও মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকার উৎসাহ প্রদান করে, আরও রয়েছে বিভিন্ন শিক্ষামুলক কাহিনী যেগুলো জানার মাধ্যমে অন্তর তার জন্য যেটি কল্যাণকর সেটি কামনা করবে আর যেটি তার জন্য ক্ষতিকর সেটিকে ঘৃণা করবে – আর এগুলো দ্বারা অন্তর অবধারিতভাবে সংশোধনের দিকে পরিচালিত হবে। সুতরাং পূর্বে যে অন্তর তাকে পথভ্রষ্ট করা কোন বিষয়ের প্রতি কামনা রাখতো আর তাকে পথপ্রদর্শনকারী কোন কিছুকে ঘৃণা করতো, সেই অন্তরই কুরআনের কারনে যা তাকে পথপ্রদর্শন করবে তার ব্যাপারে কামনা রাখবে আর যা তাকে পথভ্রষ্ট করবে তাকে ঘৃণা করবে।

মিথ্যা কামনা- বাসনাকে আহবানকারী সকল অসুস্থতাকে কুরআন দূর করে দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তর পবিত্র হয়ে যায়, যার ফলে এর কামনা- বাসনাও পবিত্র হয় আর এটি স্বাভাবিক অবস্থায় (ফিতরাত) ফিরে যায় - যে ফিতরাতের উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল; ঠিক যেমনটি চিকিৎসাপ্রাপ্ত হওয়ার পর শরীর তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। অন্তর ঈমান ও কুরআন দ্বারা এমনভাবে প্রতিপালিত হবে যে তা শক্তিশালী হয়ে পড়বে, কারন নিশ্চয়ই অন্তরের পরিশুদ্ধির ব্যাপারটি শরীরের বেড়ে উঠার মতই।

১.৩ অন্তরের একটি চিকিৎসা হল সৎ কাজ করা

যাকাহ (পরিশোধন) এর ভাষাগত অর্থ হল পরিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পাওয়া। যখন কোন কিছুর পরিশুদ্ধতা বৃদ্ধি পায় তখন বলা হয়, "কোন কিছুর যাকাহ হয়েছে।" অন্তরকে লালনপালন করার প্রয়োজন রয়েছেন যাতে করে এটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং পরিপূর্ণ ও পরিশুদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়; যেমনটি শরীরকে লালনপালনের প্রয়োজন রয়েছে যা এর জন্য কল্যাণকর, কিন্তু এর পাশাপাশি এর ক্ষতি করা থেকে যেকোন কিছুকে প্রতিরোধ করারও প্রয়োজন রয়েছে। সুতরাং শরীর বৃদ্ধি পাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এটি কল্যাণকর বিষয়াদি লাভ করবে আর এর ক্ষতিকর কিছু থেকে বিরত থাকবে। অনুরূপভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্তর এর উপকারী বিষয়গুলো অর্জন করবে আর এর ক্ষতিকারক বিষয়গুলোকে দমন করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি এমনভাবে পরিশুদ্ধ হবে না যে এটি উন্নতিলাভ করবে আর এর পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে; যেমনিভাবে এই দুটো ফ্যাক্টর ছাড়া ফুল বৃদ্ধি পায় না।

সাদাকাহ (দান করা) করার কারনে অন্তর পরিশুদ্ধতা লাভ করে কারন সাদাকাহ পাপসমূহকে প্রশমিত করে, যেমনটা পানি প্রশমিত করে আগুনকে। এর যাকাহ বলতে বুঝায় এর অতিরিক্ত কিছু, যা হল কেবলই পাপ থেকে মুক্তি। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّـهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

"তাদের কাছ থেকে সাদাকাহ গ্রহণ করো তাদেরকে পবিত্র করার জন্য আর এটির মাধ্যমে তাদের পরিশুদ্ধ করো।"
(সূরা তাওবাহ, ৯ : ১০৩)

১.৪ অন্তরের একটি চিকিৎসা হল অশালীন কাজ বর্জন করা

একইভাবে, অশালীন কাজ আর পাপ থেকে বিরত থাকা অন্তরকে এর পরিশুদ্ধির দিকে পরিচালিত করে, কারন এগুলো শরীরের কুষ্ঠরোগ বা ফুলের কাঁটার ন্যায় একই স্তরের। সুতরাং উদাহারনস্বরূপ বলা যায়, শরীর থেকে যখন অতিরিক্ত রক্ত কমিয়ে ফেলার মাধ্যমে একে কুষ্ঠরোগমুক্ত করা হয়, তখন শরীরের স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশিত হয় আর এটি রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে উন্নতিলাভ করে।

অনুরূপভাবে, যখন কেউ পাপ থেকে তাওবা করে তখন অন্তর অপবিত্রতা থেকে মুক্ত হয়, যা দ্বারা এটি পাপগুলোর সাথে সৎ কাজগুলোকে মিশ্রিত করে দেয়। সুতরাং যখন কেউ পাপ থেকে তাওবা করে তখন অন্তরের শক্তি এমনভাবে উত্থিত হয় যে এটি সৎ কাজ করার ব্যাপারে কামনা করে এবং যে বাতিল ও বিকৃত ব্যাপারগুলোতে সে একসময় নিমজ্জিত ছিল তা থেকে মুক্তি লাভ করে।

সুতরাং অন্তরের যাকাহ বলতে এর উন্নতিলাভ আর পরিপূর্ণ হওয়াকে বুঝায়। গৌরবান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّـهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَـٰكِنَّ اللَّـهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ ۗ

“আল্লাহ’র দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পরিশুদ্ধ হতে পারতে না ...।” (সূরা নূর, ২৪ : ২১)

فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّـهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨)

“...আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়ঃ ফিরে যাও, তবে তোমরা ফিরে যাবে, এটিই তোমাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধ ..।” (সূরা নূর, ২৪ : ২৮)

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّـهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

“মুমিনদেরকে তাদের দৃষ্টি অবনত করতে আর তাদের গোপন অঙ্গের হিফাযত করতে বল। এটিই তাদের জন্য অধিকতর বিশুদ্ধ ...।” (সূরা নূর, ২৪ : ৩০)

قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ (١٥)

“নিশ্চয়ই যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করে, সে সফলতা অর্জন করলো, এবং তার রবের নাম স্মরণ করলো অতঃপর সালাত আদায় করলো।” (সূরা ‘আলা, ৮৭ : ১৪- ১৫)

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (١٠)

“নিশ্চয়ই যে এটিকে পরিশুদ্ধ করে সে সফল, আর যে এটিকে কলুষিত করে সে ব্যর্থ।” (সূরা আশ- শামস, ৯১ : ৯- ১০)

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ (٣)

“তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো নিজেকে পরিশুদ্ধ করতো ?” (সূরা ‘আবাসা, ৮০ : ৩)

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ (١٨) وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ (١٩)

“আর তাকে বলা হলঃ তুমি কি তোমাকে পরিশুদ্ধ করতে চাও ? আর (এটি চাও যে) আমি তোমাকে তোমার রবের পথে পরিচালিত করি যাতে তুমি তাকে ভয় করো ?” (সূরা নাযি’আত, ৭৯ : ১৮- ১৯)

সুতরাং, যদিও তাযকিয়্যাহ (পরিশুদ্ধি) এর মৌলিক অর্থ হল উন্নতি হওয়া, দয়া এবং ধার্মিকতা বৃদ্ধি হওয়া, এটি কেবলমাত্র মন্দকে অপসারণের মাধ্যমেই অর্জন করা যাবে আর এ কারনেই আত্মার পরিশুদ্ধি উভয় বিষয়ের (সৎ কাজ করা আর পাপ কাজ এড়িয়ে চলা) সমন্বয়ে গঠিত। মহান আল্লাহ বলেন,

وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٧)

“দুর্ভোগ মুশরিকদের জন্য, যারা যাকাত প্রদান করে না আর তারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।” (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৬- ৭)

যাকাত, তাওহীদ আর ঈমান – এগুলো দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। কারন, নিঃসন্দেহে তাওহীদ অন্তর্ভুক্ত করে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কতৃত্ব অস্বীকার করাকে এবং অন্তরে আল্লাহ'র কতৃত্বের সত্যতা সমর্থন করাকে, এটি হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই) এর বাস্তবতা এবং এটিই হল সেই মূল ভিত্তি যেটি দ্বারা অন্তর পরিশুদ্ধ হয়।

তাযকিয়্যাহ (পরিশুদ্ধি) হল কেবলমাত্র কোন কিছুকে বা বিশ্বাসে বা বিবরণীতে বিশুদ্ধ করার একটি ক্রিয়া। অনুরূপভাবে বলা হয় "আদালতুহু" - যখন আপনি ন্যায়সঙ্গত হবেন বা লোকদের বিশ্বাসে ন্যায়পরায়ণ হবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ ۖ

"সুতরাং তোমাদের পরিশুদ্ধতা আছে বলে মনে করো না ..." (সূরা নাযম, ৫৩ : ৩২)

অর্থাৎ, তোমরা ঘোষণা করো না যে তোমরা পরিশুদ্ধ, আর এটি আল্লাহ'র সেই আয়াতের অনুরূপ নয় যেখানে তিনি বলেন –

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩)

"নিশ্চয়ই যে এটিকে পরিশুদ্ধ করে সে সফল।" (সূরা আশ- শামস, ৯১ : ৯)

এ কারনে মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ (٣٢)

"তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন যে কে তার ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করে।" (সূরা নাযম, ৫৩ : ৩২)

যায়নাব প্রথমে বুররা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে তিনি নিজেকে পরিশুদ্ধ করলেন, তাই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে যায়নাব বলে ডাকলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ اللَّـهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ

"তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করো নি যারা নিজের পরিশুদ্ধতার দাবী করে ? বরং আল্লাহ, যাকে ইচ্ছা তিনি পবিত্র করেন...।" (সূরা নিসা', ৪ : ৪৯)

এর অর্থ হল, তিনি যাকে খুশী তাকে পরিশুদ্ধ করেন আর তার পরিশুদ্ধতা পরিচিত করে দেন, যেমনটা একজন সংশোধনকারী কেবল তাদের পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঘোষণা করেন, যাদের ন্যায়বিচারের প্রতি তিনি সাক্ষ্য বহন করতে পারেন।

১.৫ অন্তরের পরিশুদ্ধতার উপর পাপের প্রভাব

‘আদল (সুবিচার ও ন্যায়বিচার) হল ই’তিদাল (ভারসাম্য), আর ভারসাম্যেই নির্ভর করে অন্তরের সংশোধন, যেমনটি যুলমে (ভারসাম্যহীনতা/অত্যাচার) রয়েছে অন্তরের বিকৃতি। এ কারনেই একজন ব্যক্তি প্রতিটি পাপ করার করার মাধ্যমে নিজের উপর অত্যাচার (যালিমান লি নাফসিহি) করে। যুলমের বিপরীত হল ‘আদল, তাই সেই পাপী ব্যক্তি নিজের প্রতি ন্যায়পরায়ণ থাকেনি বরং সে অন্তরকে অত্যাচার করেছে। অন্তরের সংশোধন নির্ভর করে ‘আদল এর উপর আর এর বিকৃত হওয়া নির্ভর করে যুলমের উপর। সুতরাং, আল্লাহ’র গোলাম যখন নিজেকে অত্যাচার করে তখন সে একই সময়ে অত্যাচারী আর অত্যাচারীত। অনুরূপভাবে, যখন সে ন্যায়পরায়ণ, তখন সে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি আর সেই ব্যক্তির মত, যার উপর ন্যায়বিচার করা হয়।

ব্যক্তি কোন কাজ সম্পাদন করলে সে তার সেই কাজের ফল পাবে, হোক সেটি তিক্ত বা মধুর। আল্লাহ বলেন,

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

“... সে যা অর্জন করেছে (সৎ কাজ) সেটির জন্য তার পুরস্কার রয়েছে, এবং সে যা অর্জন করেছে (পাপ কাজ) সেটির জন্য সে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে ...” (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৮৬)

কাজ শরীরকে প্রভাবিত করার পূর্বেই অন্তরকে প্রভাবিত করে – হয় উপকারের মাধ্যমে বা ক্ষতির মাধ্যমে বা সংশোধন করার মাধ্যমে। সৎ ও পবিত্র কাজ আত্মার জন্য ন্যায়বিচার স্থাপন করে, অপরদিকে মন্দ কাজ আত্মাকে অত্যাচার করে। মহান আল্লাহ বলেন,

مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (٤٦)

“যে সৎ কাজ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং যে মন্দ কাজ করে সে তার নিজের বিরুদ্ধেই সেটি করে।” (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৪৬)

إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ

“যদি তোমরা সৎ কাজ করো তবে সেটি তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই করলে, আর যদি মন্দ কাজ করো তবে সেটি তোমরা নিজেদের বিরুদ্ধেই করলে।” (সূরা আল- ইসরা’, ১৭ : ৭)

সালাফদের [১৫] মধ্যে বেশ কিছু ব্যক্তি বলেন, “নিশ্চয়ই সৎ কাজগুলো অন্তরের একটি জ্যোতি, শরীরের জন্য শক্তি বৃদ্ধিকারী, চেহারার জ্যোতি, ব্যাপক রিযকের কারন এবং সৃষ্টির অন্তরগুলোতে ভালোবাসা। নিশ্চয়ই মন্দ কাজগুলো অন্তরে একটি অন্ধকার, চেহারার উপর অন্ধকারময়তা, শরীরের জন্য দুর্বলতা, রিযক কমে যাওয়ার কারন আর সৃষ্টির অন্তরগুলোতে ঘৃণা।”

মহান আল্লাহ বলেন,

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١)

“প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।” (সূরা তূর, ৫২ : ২১)

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (٣٨)

“প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ।” (সূরা মুদদাসসির, ৭৪ : ৩৮)

وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّـهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ۗ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا ۖ

“কুরআন দিয়ে তাদেরকে উপদেশ দিতে থাকুন, যাতে কোন ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু, সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না, আর এই অবস্থার সম্মুখীন না হয় যে দুনিয়াভর বিনিময় বস্তু দিয়েও মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, তারা এমনই লোক যে, নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে।” (সূরা আন’আম, ৬ : ৭০)

“তাবসালা” অর্থ হল নিপীড়ন করা, শেকল দিয়ে আটকে রাখা এবং আকৃষ্ট করা।

একইভাবে, শরীর যখন অসুস্থতা থেকে মুক্তি পায় তখন বলা হয়, “তার স্বভাব ও প্রকৃতির ভারসাম্য হয়েছে।” এর কারন হল, ন্যায় ও অন্যায় মিশে যাওয়া থেকে নিরাপদ - এমন পরিপূর্ণ ভারসাম্য অর্জনের কোন উপায় না থাকা সত্ত্বেও অসুস্থতা স্বভাব- প্রকৃতিকে বিকৃত করে দেয়, কিন্তু আদর্শ বা আদর্শের কাছাকাছি ভারসাম্যের জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে।

একই অবস্থা অন্তরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এর স্বাস্থ্য আর সংশোধন নির্ভর করে ভারসাম্যের উপর আর এর অসুস্থতা নির্ভর করে পথভ্রষ্টতা, অত্যাচার ও অবান্তরতার উপর। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করাটা অসম্ভব -

হোক সেটি কাজ বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে। কিন্তু আদর্শ বা আদর্শের কাছাকাছি ভারসাম্যের জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কারনেই সালাফি পদ্ধতিকে বলা হয় "আদর্শিক পদ্ধতি"। আল্লাহ বলেন,

وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ

"তোমরা কখনো স্ত্রীদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না যদিও তোমরা কামনা করো..." (সূরা নিসা', ৪ : ১২৯)

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ

"...আর আদান- প্রদানে পরিমান ও ওজন সঠিকভাবে করবে, আমি কারো উপর তার সাধ্যাতীত ভার (দায়িত্ব- কর্তব্য) অর্পণ করি না..." (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫২)

মহিমান্বিত আল্লাহ তার রসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলেন আর নাযিল করেছিলেন আসমানি কিতাবসমূহ, যাতে করে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ন্যায়বিচারের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপটি হল আল্লাহ'র সাথে কোন অংশীদার স্থাপন না করে একমাত্র আল্লাহ'র ইবাদাহ করা, এরপর লোকজনের অধিকারের প্রতি উপযুক্ত ন্যায়বিচার করা, এরপর নিজের ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ হওয়া।

১.৬ যুলমের ধরনসমূহ

যুলম তিন ধরনের, আর এর সবই অন্তরের অসুস্থতা থেকে হয়ে থাকে। অন্তরের সুস্বাস্থ্য ও পবিত্রতা নির্ভর করে ন্যায়বিচারের উপর। ইমাম আহমাদ বিন হানবাল এক ব্যক্তিকে বললেন, "আপনি সুস্থ হলে কাউকেই ভয় করতেন না", এর অর্থ হল - মানুষের ব্যাপারে আপনার মধ্যে যে ভয় আছে সেটি আপনার ভিতর থাকা একটি অসুস্থতার কারনেই, যেমন শিরক ও পাপের অসুস্থতা।

অন্তরের সংশোধিত হওয়ার ভিত্তি নির্ভর করে এটির জীবিত ও আলোকিত হওয়ার উপর। মহান আল্লাহ বলেন,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ

"এমন ব্যক্তি - যে ছিল মৃত, এরপর তাকে আমি জীবন প্রদান করি আর তার জন্য আমি এমন আলোর (ব্যবস্থা) করে দেই যার সাহায্যে সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে থাকে; সে কি এমন কোন ব্যক্তির মত হতে পারে যে (ডুবে) আছে অন্ধকারপুঞ্জের মধ্যে, তা থেকে বের হওয়ার পথই পাচ্ছে না ?" (সূরা আন'আম, ৬ : ১২২)

এ কারনেই আল্লাহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে অন্তরের জীবন, এর প্রদীপ্তি, মৃত্যু ও অন্ধকারময়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, যেমন গৌরবান্বিত আল্লাহ বলেন,

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا

"যাতে করে সে জীবিতদেরকে সতর্ক করতে পারে।" (সূরা ইয়া- সিন, ৩৬ : ৭০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّـهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٢٤)

"হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ ও তার রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন তিনি তোমাদের এমন কিছুর দিকে ডাকেন যা তোমাদেরকে জীবন দান করবে, জেনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করেন; তোমাদের সবাইকে তার কাছেই ফিরে যেতে হবে।" (সূরা আনফাল, ৮ : ২৪)

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ

"তিনিই মৃত থেকে জীবিতকে বের করে নিয়ে আসেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করে নিয়ে আসেন...।" (সূরা রুম, ৩০ : ১৯)

এ উদাহারনগুলো দ্বারা তিনি একজন কাফির থেকে একজন মুসলিমকে আর একজন মুসলিম থেকে একজন কাফিরকে প্রকাশ করে দিলেন।

নির্ভরযোগ্য হাদিসে বলা আছে - "যে ঘরে আল্লাহর স্মরণ করা হয় আর যে ঘরে আল্লাহ'র স্মরণ করা হয় না সেগুলো জীবিত ও মৃতের অনুরূপ।" [১৬]

আল- বুখারির সাহিহতে বর্ণিত একটি হাদিস হল - "তোমরা তোমাদের কিছু কিছু সালাত তোমাদের ঘরে আদায় করবে, তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানাবে না।" [১৭]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ

"যারা আমার নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তারা হল বধির, বোবা ও অন্ধকারে নিমজ্জিত।" (সূরা আন'আম, ৬ : ৩৯)

আল্লাহ "নূরের আয়াত" আর "অন্ধকারের আয়াত" উল্লেখ করেছেন -

اللَّـهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّـهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তার জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরনের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ; এটি প্রজ্বলিত করা হয় পূত-

পবিত্র যয়তুন বৃক্ষের তেল দিয়ে যা প্রাচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও নয়, আগুন ওকে স্পর্শ না করলেও যেন ওর তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে; জ্যোতির উপর জ্যোতি!" (সূরা নূর, ২৪ : ৩৫)

এটি হল আল্লাহ'র বিশ্বাসী বান্দার অন্তরে থাকা ঈমানী নূরের দৃষ্টান্ত। এরপর আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّـهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ ۗ وَاللَّـهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (٣٩) أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ۚ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّـهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ (٤٠)

"যারা কুফরি করে তাদের কাজ মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে, কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হলে দেখবে ওটা কিছু নয় এবং সে সেখানে আল্লাহ্‌কে পাবে, অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণমাত্রায় দিবেন, আল্লাহ হিসাব গ্রহনে তৎপর। অথবা (তাদের কর্মকাণ্ডের উদাহারন হল) অতল সমুদ্রের অভ্যন্তরস্থ গভীর অন্ধকারের মতো, অতঃপর তাকে একটি বিশাল আকারের ঢেউ এসে ঢেকে (আরো অন্ধকার করে) দিলো, তার উপর আরো একটি ঢেউ (এলো), তার উপর (ছেয়ে গেলো কিছু) ঘন কালো মেঘ; এক অন্ধকারের উপর (এলো) আরেক অন্ধকার; এমনকি সে (এই অবস্থায়) হাত বের করলে তা আদৌ দেখতে পাবে না; বস্তুত আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার কোন জ্যোতিই নেই।" (সূরা নূর, ২৪ : ৩৯-৪০)

সুতরাং, ৩৯ নাম্বার আয়াতে বাতিল বিশ্বাস আর এসব বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কাজগুলোর একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যক্তি সেই বাতিল বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত কাজগুলোকে উপকারী হিসেবে বিবেচনা করে, কিন্তু সেগুলো বিচার দিবসে যখন তার কাছে এসে উপস্থিত হবে, তখন সে সেগুলোতে কোন উপকারই খুঁজে পাবে না। বরং আল্লাহ তার এই কাজগুলোর পূর্ণ প্রতিদান দিবেন দোযখে।

৪০ নাম্বার আয়াতে ব্যাপক অজ্ঞতা, ঈমানের অভাব ও বিশুদ্ধ ইলমের অভাবের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়গুলো যার মধ্যে রয়েছে সে একটির উপর আরেকটি অন্ধকারে রয়েছে, সে কোনকিছুই দেখতে সক্ষম হয় না; কারন নিশ্চয়ই দেখতে পাওয়া তো কেবল ঈমানের আলো আর সঠিক ইলমের দ্বারাই ঘটে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ (٢٠١)

"নিঃসন্দেহে যারা মুত্তাকী, তাদের যদি কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তবে তারা (সাথে সাথেই) আত্মসচেতন হয়ে যায় আর এরপর তারা (সঠিকভাবে) দেখতে পায়।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২০১)

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ

"সে নারী তার প্রতি আসক্ত হয়েছিল আর সেও আসক্ত হয়ে পড়তো যদি না তার রবের নিদর্শন সে দেখতে পেতো...।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ২৪)

এর অর্থ হল, তার অন্তর ঈমানের যে প্রমাণ অর্জন করেছে, সেটির কারনে আল্লাহ তাকে সেই আসক্তি থেকে তার মুখ ফিরিয়ে দিয়েছেন আর তার জন্য একটি পূর্ণ সওয়াব লিখে দিয়েছেন এবং তার বিরুদ্ধে কোন পাপ লিখে রাখা হয় নি, যেহেতু তিনি অসৎ কাজ না করে সৎ কাজ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন,

الر ۚ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١)

"...যাতে আপনি মানবজাতিকে তাদের রবের নির্দেশক্রমে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনতে পারেন...।" (সূরা ইব্রাহীম, ১৪ : ১)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ

"আল্লাহই ইমানদারদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে শয়তান তাদের পৃষ্ঠপোষক, সে তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়...।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৫৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (٢٨)

"হে ইমানদারগণ, তোমরা আল্লাহ'র ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করো আর তার প্রেরিত রসূলের উপর ঈমান আনো, এর ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ অনুগ্রহে ভূষিত করবেন, তিনি তোমাদের দিবেন একটি আলো, যার সাহায্যে তোমরা পথ চলতে সক্ষম হবে...।" (সূরা হাদিদ, ৫৭ : ২৮)

এ কারনেই আল্লাহ ঈমানের জন্য দুই ধরনের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন - পানির দৃষ্টান্ত, যেটি দ্বারা জীবন অস্তিত্বমান থাকে আর ফেনা, যা পানির সাথে আগমন করে। আরেকটি দৃষ্টান্ত হল আগুনের, যেটি দ্বারা আলো উদ্ভূত হয়। আল্লাহ বলেন,

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّـهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۖ

"তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, এরপর (নদী- নালা ও তার) উপত্যকাসমূহ তাদের নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয়, এরপর এ প্লাবন (আবর্জনার) ফেনা বহন করে (উপরে) নিয়ে আসে; (আবার) যারা অলংকার ও যন্ত্রপাতি বানানোর জন্য (ধাতুকে) আগুনে উত্তপ্ত করে, (তখনো) তাদের এক ধরণের আবর্জনা ফেনা (হয়ে) উপরে উঠে আসে; এভাবেই আল্লাহ হক ও বাতিলের উদাহারন দিয়ে থাকেন, অতঃপর (আবর্জনার) ফেনা এমনিই বিফলে চলে যায় এবং (পানি-) যা মানুষের প্রচুর উপকারে আসে তা জমিনেই থেকে যায়..." (সূরা রা'দ, ১৩ : ১৭)

অনুরূপভাবে, আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে দুটো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন -

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّـهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ (١٨) أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ۚ وَاللَّـهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (١٩) يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ

أَبْصَارَهُمْ ۚ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّـهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)

"এদের উদাহারন হল সে (হতভাগ্য) ব্যক্তির মতো, যে (অন্ধকারে) আগুন জ্বালাতে চাইলো, যখন সেটি তার গোটা পরিবেশটাকে আলোকোজ্জ্বল করে দিলো, তখন (হঠাৎ করে) আল্লাহ তাদের (কাছ থেকে) আলোটুকু ছিনিয়ে নিলেন আর তাদের (এমন) অন্ধকারে ফেলে রাখলেন যে তার কিছুই দেখতে পেলো না। (এদের অবস্থা হচ্ছে,) এরা (কানেও) শোনে না, (চোখেও) দেখে না, কথাও বলতে পারে না, অতএব এসব লোক (সঠিক পথের দিকে) ফিরে আসবে না। অথবা (এদের উদাহারন হচ্ছে), আসমান থেকে নেমে আসা বৃষ্টির মতো, এর মাঝে রয়েছে (আবার) অন্ধকার, মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক, বিদ্যুতের গর্জন ও মৃত্যুর ভয়ে এরা নিজেদের কানে নিজেদের আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখে (এরা জানে না), আল্লাহ কাফিরদেরকে (সব দিক থেকেই) ঘিরে রেখেছেন। মনে হয় এখনই বিদ্যুৎ এদের চোখকে নিস্প্রভ করে দিবে, (এ আতঙ্কজনক অবস্থায়) আল্লাহ যখন এদের জন্য একটু আলো জ্বালিয়ে দেন তখন এরা তার মধ্যে চলতে থাকে, আবার তিনি যখন তাদের উপর অন্ধকার চাপিয়ে দেন তখন এরা (একটু থমকে) দাঁড়ায়; অথচ আল্লাহ চাইলে (সহজেই) তাদের শোনার ও দেখার (ক্ষমতা) ছিনিয়ে নিতে পারতেন; নিশ্চয়ই তিনি সবকিছুর উপর অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন সর্বশক্তিমান।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭-২০)

সুতরাং আল্লাহ মুনাফিকদের ব্যাপারে এক ব্যক্তির মাধ্যমে একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যে ব্যক্তি আগুন প্রজ্বলিত করলো, প্রত্যেকবার এটি প্রজ্বলিত হওয়ার সময় আল্লাহ সেটিকে নিভিয়ে দিলেন। আর পানির দৃষ্টান্ত, যেখানে অন্ধকার, বিজলী ও বজ্রধ্বনি সহকারে বৃষ্টির পানি আকাশ থেকে পতিত হয়। এসব দৃষ্টান্তের বিস্তারিত ব্যাখ্যার স্থান এটি নয়, কারন এখানে উদ্দেশ্য হল কেবল অন্তরের জীবন ও এর প্রদীপ্তি সম্পর্কে উল্লেখ করা।

১.৭ অন্তরের জীবন

একটি দুয়া'র বর্ণনায় আছে, "কুরআনকে আমাদের অন্তরের প্রতিপালনকারী (রাবি') আর আমাদের বুকের জ্যোতি করে দিন।" [১৮]

রাবি' - এর অর্থ হল বৃষ্টি, যা আকাশ থেকে নেমে আসে আর উদ্ভিদকে পরিপুষ্ট করে। যে ঋতুতে প্রথম বৃষ্টি পড়ে, আরবেরা তাকে আর-রাবি' বলে, কারন বৃষ্টি পড়ার কারনে উৎপাদনের উন্নতি ঘটে। অনারবেরা শীত পরবর্তী ঋতুকে আর-রাবি' বলে, কারন এই ঋতুতে ফল উৎপাদনকারী উদ্ভিদগুলোতে ফুল ও পাতা প্রতীয়মান হয়।

১.৮ মৃত অন্তরের অবস্থা

জীবিত ও আলোকিত অন্তর তার ভিতরে থাকা আলোর কারনে দেখতে, শুনতে ও অনুধাবন করতে পারে; কিন্তু মৃত অন্তর দেখতে, শুনতে বা অনুধাবন করতে পারে না। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١)

"আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেউ আহবান করলে শুধু চিৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনে না; (মূলত) এরা বধির, বোবা, অন্ধ, (এ কারনে হিদায়াহ'র কথাও) এরা বুঝে না।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭১)

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ (٤٢) وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ (٤٣)

"এদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা তোমার দিকে কান পেতে রাখে; তুমি কি বধিরকে (আল্লাহ'র কালাম) শোনাবে, যদিও তারা এর কিছুই বুঝতে না পারে ? এবং ওদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকে, কিন্তু তুমি কি অন্ধকে পথ দেখাবে, যদিও তারা নিজেরা এর কিছুই দেখতে না পায় ?" (সূরা ইউনুস, ১০ : ৪২-৪৩)

وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٥)

"তাদের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে (বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয়) তোমার কথা কান দিয়ে শুনছে, (কিন্তু আসলে) আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা দিয়ে রেখেছি, যার কারনে তারা কিছুই অনুধাবন করতে পারে না, আমি তাদের কানে বধিরতা অর্পণ করেছি; (মূলত) তারা যদি (আল্লাহ'র) সব নিদর্শন দেখেও নেয়, তবু তারা তার প্রতি ঈমান আনবে না, এমনকি তারা যখন তোমার সামনে আসবে তখন তোমার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে, (কুরআনের আয়াত সম্পর্কে) কাফিররা বলবে, 'এটি তো প্রাচীনকালের লোকদের কিসসা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই না।' " (সূরা আন'আম, ৬ : ২৫)

সুতরাং আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন যে তাদের অন্তর অনুধাবন করতে পারে না, তাদের কান শ্রবণ করতে পারে না, আর তারা যা দেখে তাতে বিশ্বাসও করে না, যেমনটি আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এই আয়াতের মাধ্যমে –

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

"তারা বলেঃ তুমি যে বিষয়ের দিকে আমাদের আহবান করছো, সেটির জন্য আমাদের অন্তরগুলো আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে আছে, আমাদের কানেও রয়েছে বধিরতা, আমাদের আর তোমার মাঝে একটি দেয়াল (দাঁড়িয়ে) আছে...।" (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫)

সুতরাং তারা নিজেরাই তাদের অন্তর, কান ও চোখের উপর থাকা অন্তরায়ের উল্লেখ করেছে। তাদের শরীর জীবিত, যা দেখতে ও শুনতে পায়, কিন্তু এটি তো মৃত অন্তরবিশিষ্ট একটি শরীরের জীবন মাত্র – ঠিক একটি পশুর মতো, কারন পশুরাও দেখতে ও শুনতে পারে, খেতে ও পান করতে পারে আর বিয়েও করে। এ কারনে আল্লাহ বলেন,

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (١٧١)

"আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায়, যেমন কেউ আহবান করলে শুধু চিৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শুনে না; (মূলত) এরা বধির, বোবা, অন্ধ, (এ কারনে হিদায়াহ'র কথাও) এরা বুঝে না।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৭১)

তাদেরকে তুলনা করা হল গবাদি পশুর সাথে, যার প্রতি পশুপালক ডাক দেয় এবং তারা চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শুনতে পায় না (অর্থাৎ, তারা বুঝতে পারে না যে কি বলা হল), যেমনটি বলা হয়েছে এই আয়াতে –

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤)

"তুমি কি সত্যিই মনে করো যে তাদের অধিকাংশ লোক শুনে বা বুঝে ? ওরা হল পশুর মত, এমনকি ওরা অধিকতর বিভ্রান্ত।" (সূরা ফুরকান, ২৫: ৪৪)

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَـٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (١٧٩)

"এবং প্রকৃতপক্ষে আমি বহু জীন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, তাদের কান রয়েছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শুনে না, তারা হল পশুর মত, বরং সেটি থেকেও অধিকতর বিভ্রান্ত।" (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৭৯)

একদল মুফাসসির এই আয়াতগুলো উল্লেখ করে তাদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত আয়াত যেমন –

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ ۚ

"আর যখন মানুষকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে তখন আমাকে ডাকতে থাকে শুয়ে, বসে আর দাঁড়িয়ে; এরপর যখন আমি সেই কষ্ট ওর থেকে দূর করে দেই তখন সে নিজের পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসে, যে কষ্ট তাকে স্পর্শ করেছিল তা মোচন করার জন্য সে যেন আমাকে কখনোই ডাকেনি !" (সূরা ইউনুস, ১০ : ১২)

এসব আয়াত ও এর অনুরূপ আয়াত, যেখানে মানুষের অপরাধ আর তাদের নিন্দা সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে, মুফাসসিররা সে সম্পর্কে বলেন, "এই আয়াতগুলো কাফিরদের ব্যাপারে নির্দেশ করে, আর এখানে 'মানুষ' অর্থ হল 'কাফিররা'।"

তাই কোন ব্যক্তি যদি এই ব্যাখ্যা শোনার পর এটি চিন্তা করে, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করে সে এই নিন্দা ও ভীতিপ্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং তার চিন্তাভাবনা এই আয়াতগুলোকে আরবদের মধ্যে প্রকাশ্যে শিরক প্রকাশকারীদের সাথে সংযুক্ত করে অথবা তার জানামতে তুর্কি ও ভারতের প্রকাশ্যে কুফর প্রদর্শনকারী ইয়াহুদি, খ্রিস্টান আর মুশরিকদের সাথে সংযুক্ত করে, তবে সে ব্যক্তি এই আয়াতগুলো থেকে উপকৃত হবে না যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার গোলামদেরকে পথপ্রদর্শনের জন্য। সুতরাং এর জবাবে বলা যায় –

প্রথমতঃ যারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করে তাদের মধ্যে মুমিন- মুসলিম আর মুনাফিক রয়েছে। আর মুনাফিকেরা সব সময়ই সংখ্যায় অনেক ছিল। তাদের অবস্থান হবে দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে।

দ্বিতীয়তঃ ব্যক্তির মধ্যে ঈমান থাকার সাথে সাথে নিফাক আর কুফরও থাকতে পারে, যেমনটি জানা যায় আল- বুখারি ও মুসলিম কতৃক বর্ণিত রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই হাদিস থেকে –

“যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকে সে খাঁটি মুনাফিক। যার মধ্যে এর কোন একটি স্বভাব থাকবে তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকির একটা স্বভাব থেকে যায় - আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা কথা বলে, চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে এবং বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল গালি দেয়।” [১৯]

সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জানিয়ে দিলেন যে যার মধ্যে এর কোন একটি অংশ থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটা অংশ থাকবে।

আর আল- বুখারির সাহিহ তে প্রতিষ্ঠিত এক হাদিস থেকে জানা যায় যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আবু যার (রাঃ) কে বললেন, “... তোমার মধ্যে এখনও জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে।” [২০]

আবু যার (রাঃ) ছিলেন লোকদের মধ্যে ঈমানের দিক দিয়ে সবচেয়ে সত্যনিষ্ঠ।

নির্ভরযোগ্য হাদিসে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, “জাহিলিয়্যাহ (ইসলাম- পূর্ব অজ্ঞতা)'র চারটি বৈশিষ্ট্য আমার উম্মতের মধ্যে থাকবে -বংশধরদের ব্যাপারে অহংকার করা, বংশের বদনাম করা, মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা, নক্ষত্রের কাছ থেকে বৃষ্টি চাওয়া।” [২১]

“রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষেই তোমাদের পূর্বে যারা এসেছে তোমরা ক্রমান্বয়ে তাদের পথ অনুসরণ করবে এমনভাবে যে যদি তারা কোন সরীসৃপের গর্তে প্রবেশ করে তবে তোমরাও সেটি করবে।’ সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কি ইয়াহুদি ও খ্রিস্টান ?’ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, ‘তারা ছাড়া আর কারা ?’ ” [২২]

“রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ‘পূর্বের জাতিরা যেগুলোর প্রতি আসক্ত ছিল/যেগুলো গ্রহণ করেছিলো, আমার উম্মতও এক হাত এক হাত করে আর এক বিঘত এক বিঘত করে সেগুলোর প্রতি আসক্ত হবে/সেগুলো গ্রহণ করবে।’ সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ‘তারা কি পার্সিয়ান আর রোমান ?’ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন, ‘তবে লোকদের মধ্যে আর কারা হতে পারে ? ’ ” [২৩]

ইবনে আবি মুলাইকাহ বলেন, “আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ত্রিশ জন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করেছি, তারা সবাই নিজেদের সম্পর্কে নিফাকের ব্যাপারে ভয় করতেন।” [২৪]

আলী (রাঃ) বা হুজাইফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন, “অন্তর চার ধরনের - (১) বিশুদ্ধ অন্তর - যা আলোকদানি দ্বারা আলোকিত, এটি মুমিনের অন্তর; (২) আবৃত অন্তর - এটি কাফিরদের অন্তর; (৩) বিপর্যস্ত অন্তর - এটি মুনাফিকের অন্তর; (৪) এবং দুটো ব্যাপারেই আকর্ষণ রয়েছে এমন অন্তর - যে সময়ে ঈমানের আহবান আর নিফাকের আহবান করা হয়, (তখন) এ লোকগুলো তাদের সৎ কাজগুলোকে পাপ কাজের সাথে মিশ্রিত করে দেয়।”

সুতরাং, জানা ও বুঝা গেলো যে, আল্লাহ ঈমান সম্পর্কে -হয় সেটি ঈমানের শাখার প্রশংসা করে বা কুফরির শাখার নিন্দা করে, যা কিছুই বলেছেন, তার সবগুলো থেকেই প্রত্যেক আল্লাহ'র গোলাম উপকৃত হবে।

উল্লেখিত অবস্থা আর তাদের অবস্থা একই, যারা আল্লাহ'র এই আয়াত -

اهدنا الصراط المستقيم (٦)

"আমাদেরকে হিদায়াত দিন (পরিচালিত করুন) সহজ সরল পথে।" (সূরা ফাতিহা, ১ : ৬)

এই আয়াত সম্পর্কে তারা বলে, "আল্লাহ তো মুসলিমদেরকে ইতিমধ্যেই হিদায়াত দিয়েছেন, তাহলে হিদায়াত চাওয়ার উপকারিতা কি ?"

তখন তাদের মধ্যে থেকে কিছু ব্যক্তি এই বলে জবাব দেয় যে এর অর্থ হল "আমাদেরকে হিদায়াতের উপর দৃঢ় রাখুন" যেমনটা আরবেরা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে বলতো, "আমি তোমার কাছে আসার আগ পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকো।" তাদের মধ্য থেকে অন্যরা বলে যে এর অর্থ হল "আমাদের অন্তরকে হিদায়াতের উপর দৃঢ় রাখুন" এবং এটি যে, দৃঢ়তার জন্য প্রার্থনা করা বাদ পড়ে গেছে। আবার তাদের মধ্যে অন্যান্যরা বলে যে এর অর্থ হল, "আমার হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিন।"

এই প্রশ্ন উদিত হওয়ার সত্যিকারের কারন হল, যেটির প্রতি আল্লাহ'র গোলাম হিদায়াত প্রার্থনা করে, অর্থাৎ 'সিরাতুল মুস্তাকিম' (সহজ সরল পথ) - সেটির ব্যাপারে তাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার অনুপস্থিতি। কারন এই আয়াতের অর্থ হল, আল্লাহ'র যা কিছু করতে আদেশ করেছেন তা পালন করা আর যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করার মাধ্যমে তার আদেশ- নিষেধ অনুযায়ী আমল করতে পারার জন্য তার কাছে হিদায়াত চাওয়া।

১.৯ কল্যাণকর জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা

এর কারন হল, যদিও ব্যক্তি সাধারণভাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে আল্লাহ'র রসূল হিসেবে আর কুরআনকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাধারনভাবে উপকারী আর ক্ষতিকর জ্ঞান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন রয়েছে। যে ক্ষেত্রগুলোতে তার কোন জ্ঞান নেই আর বিষয়বস্তুসমূহের চমৎকার দৃষ্টিকোণে তাকে যা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে আর যা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তার সে সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। (শুধু তাই নয়, এটি ছাড়াও আমরা এটি আবিস্কার করেছি যে,) ব্যক্তির যেটি সম্পর্কে জ্ঞান আছে সে তার অধিকাংশই চর্চা করে না! ধরা যাক, ব্যক্তির কাছে কুরআন ও সুন্নাহতে থাকা সব আদেশ ও নিষেধ পৌঁছে গেছে, কুরআন ও সুন্নাহ যে বিধানগুলো বহন করে সেগুলো সাধারণ ও সার্বজনীন, যেটির কারনে প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিকে উল্লেখ করা সম্ভব নয়; কাজেই ব্যক্তিকে এভাবে সহজ সরল পথের (সিরাতুল মুস্তাকিম) দিকে হিদায়াত প্রার্থনা করার জন্য আদেশ করা হয়েছে।

সহজ সরল পথ (সিরাতুল মুস্তাকিম) এর দিকে হিদায়াত পাওয়া এই ব্যাপারগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করেঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) যেটি সহকারে এসেছেন তা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখা, যা তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণ নির্দেশের অধীনে আসে তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকা; কারন ব্যক্তি যদি তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করে তবে নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র জ্ঞান থাকাই তার হিদায়াত অর্জনের কারন হবে না। এ কারনেই আল্লাহ হুদাইবিয়্যাহ'র সন্ধির পর তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলেন,

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (١) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّـهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا (٢)

"নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করেন এবং তোমার প্রতি তার অনুগ্রহ পূর্ণ করেন আর সহজ সরল পথে তোমাকে পরিচালিত করেন।" (সূরা ফাতহ, ৪৮ : ১-২)

মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (١١٧) وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (١١٨)

"আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব (তাওরাত)। এবং আমি তাদের উভয়কে পরিচালিত করেছিলাম সহজ সরল পথে।" (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১১৭-১১৮)

মুসলিমরা সেসব বিষয়ে পৃথক হয়েছে, যা আল্লাহ মূলগ্রন্থের বিষয়গুলো থেকে আকাঙ্খা করেছেন – জ্ঞানের বিষয়গুলো, ঈমান ও আমল; যদিও তারা সবাই একমত যে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সত্য আর কুরআনও সত্য। যদি তারা সকলেই সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে পুরোপুরি হিদায়াত অর্জন করতো তবে তারা কখনোই পৃথক হতো না। অধিকন্তু, আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে এমন অধিকাংশই আল্লাহ্‌কে অমান্য করেছে আর তার পথ অনুসরণ করেনি। তারা যদি এসব বিষয়ে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হিদায়াত পেতো তবে তারা অবশ্যই তাদেরকে যা করতে আদেশ করা হয়েছে তা সম্পাদন করতো আর যা থেকে নিষেধ করা হয়েছে তা বর্জন করতো। আর এই উম্মাহ'র মধ্যে থেকে আল্লাহ তাদেরকেই হিদায়াত দিয়েছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আল্লাহ'র মুত্তাকী বন্ধু হতে পেরেছিলেন; এরপর এর সবচেয়ে বড় কারন হল তারা আল্লাহ'র কাছে এই দুয়া করতেন –

اهدنا الصراط المستقيم (٦)

"আমাদেরকে হিদায়াত দিন (পরিচালিত করুন) সহজ সরল পথে।" (সূরা ফাতিহা, ১ : ৬)

সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তাদের প্রতিনিয়তই আল্লাহ'র সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে – এই জ্ঞানটি অন্তরে রেখে তারা প্রত্যেক সালাতে এই দুয়াটি পাঠ করতেন। সুতরাং, প্রতিনিয়তই আল্লাহ্'র সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে এর সত্যতা স্বীকার করে বার বার এই দুয়াটি করার কারনে তারা আল্লাহ'র মুত্তাকী বন্ধুতে পরিণত হোন।

সাহল বিন 'আবদুল্লাহ আত- তুস্তরি বলেন, "আল্লাহ ও তার গোলামের মধ্যে প্রয়োজন অপেক্ষা তার কাছাকাছি কোন গমনপথ নেই।"

অতীতে হিদায়াতপ্রাপ্ত হওয়া ব্যক্তির ভবিষ্যতেও হিদায়াতের প্রয়োজন রয়েছে –এটি তাদের সেই বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ, যারা বলেন যে এর অর্থ হল "আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করুন আর হিদায়াত দিন সিরাতুল মুস্তাকিমের উপর দৃঢ় হওয়ার জন্য"। সেসব ব্যক্তিদের মত, যারা বলে যে এর অর্থ হল "আমাদের হিদায়াত বৃদ্ধি করে দিন", এটি পূর্বে যা বলা হয়েছে সেটিই অন্তর্ভুক্ত করে।

কিন্তু বর্ণিত সবই নির্দেশ করে সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হিদায়াতকে, যা ভবিষ্যতে আল্লাহ প্রদান করবেন। নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতে কি আমল করা হবে তা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, যা কিনা বর্তমানে অর্জিত হয় নি। ব্যক্তি হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসেবে বিবেচিত হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে ভবিষ্যতে তার জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে; তবে এটিও সম্ভব যে তার জ্ঞান ভবিষ্যতে তার অন্তরে থাকবে না বরং তার অন্তর থেকে তা দূর হয়ে যেতে পারে; আর যদি সেই জ্ঞান তার অন্তরে থাকে তবে এ সম্ভাবনাও আছে যে সে ভবিষ্যতে তার উপর আমল করবে না।

কাজেই মানবজাতির সকলের জন্যই আল্লাহ'র কাছে এই দুয়া করাটা অত্যন্ত জরুরী, এ কারনেই আল্লাহ এটিকে প্রত্যেক সালাতে গোলামদের জন্য ফরয করে দিয়েছেন আর এই দুয়াটি তাদের জন্য যেমনটা প্রয়োজনীয়, অন্য কোন দুয়া এটির মতো প্রয়োজনীয় নয়। যখন সিরাতুল মুস্তাকিমের দিকে হিদায়াত অর্জিত হয় তখন আল্লাহ'র সাহায্য, রিযক আর আত্মার কাঙ্খিত সকল সুখ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে পাওয়া যায়। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

১.১০ অন্তরের জীবন - এর বাস্তবতা

জেনে রাখুন যে, অন্তর এবং এটি ছাড়া আর অন্য কিছুর জীবন নিছকই সংবেদনশক্তি, নড়াচড়া করা আর সংকল্প করার কোন একটি, অথবা অনুমান ও সংকল্প করার মতো নিছকই জ্ঞান ও সক্ষমতার কোন একটি, অথবা নিছকই জ্ঞান ও সক্ষমতার কোন একটি নয়; যেটি গ্রহণ করেছেন আবু আল- হুসাইন আল- বাসরি'র মতো আল্লাহ ও তার ক্ষমতা সম্পর্কিত জ্ঞানের একদল অন্বেষণকারী। তারা বলেছেন, "একজন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান রাখেন আর সক্ষম, কেবলমাত্র তিনিই জীবিত বলে বিবেচিত হবেন।"

এটি জীবনের অবস্থা নয়। বরং জীবন হল একটি গুণ, যা বর্ণিত বিষয়গুলোতে স্বাধীনভাবে উপস্থিত থাকে, আর এটি হল জ্ঞানের উপস্থিতি, সংকল্প আর পছন্দের ফলে কাজ করার একটি শর্ত। জীবন এগুলোর আবশ্যকীয় ফলাফলও। সুতরাং প্রত্যেক জীবন্ত কিছুর রয়েছে উপলব্ধি, সংকল্প; এবং যেসব কিছুর জ্ঞান ও সংকল্প রয়েছে আর পছন্দের ফলে কাজ করে, সেগুলো জীবিত।

(আরবিতে) "জীবন" শব্দটি থেকে নামবাচক শব্দ "লজ্জা" এর উৎপত্তি হয়েছে। তাই যদি অন্তর জীবিত থাকে, তাহলে এর মালিকও জীবিত থাকবে। অন্তর লজ্জা ধারণ করে, যা একে মন্দ আর ঘৃণ্য ও নিন্দিত কাজ থেকে বাধা দেয়, কারন এ ধরনের কাজ থেকে অন্তরের নিরাপত্তা নির্ভর করে অন্তরের লজ্জাশীলতার উপর ।

এ কারনে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ।" [২৫]

"লজ্জাশীলতা আর স্বল্প কথা বলা ঈমানের শাখাসমূহের মধ্যে দুটো শাখা, আর অশ্লীলতা ও বেশী কথা বলা নিফাকের শাখাসমূহের মধ্যে দুটো শাখা।" [২৬]

এ কারনেই জীবিত সত্তা ঘৃণ্য ও নিন্দিত কাজ দ্বারা পরিস্কারভাবেই প্রভাবিত হয় আর তার একটি সংকল্প রয়েছে, যা তাকে বিরত রাখে সেগুলো সম্পাদন করা থেকে; এটি হল লজ্জাবিহীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপরীত, কারন লজ্জাবিহীন ব্যক্তি (অর্থাৎ, তার অন্তর) জীবিত নয়, কাজেই তার লজ্জাশীলতা নেই, এ কারনে ঈমান নেই যা তাকে পাপ কাজ থেকে বাধা দিবে।

সুতরাং, অন্তর যদি জীবিত থাকে আর ব্যক্তি তার শরীর থেকে এর বিচ্ছেদের মাধ্যমে মারা যায়, তাহলে আত্মার মৃত্যু নির্ভর করবে ব্যক্তির শরীর থেকে এর বিচ্ছেদের উপর, কেবলমাত্র এটি থেকে প্রান ত্যাগে মারা যাওয়ার উপর এর মৃত্যু নির্ভর করবে না। এ কারনে গৌরবান্বিত আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ

"আর যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত বলো না বরং তারা জীবিত...।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫৪)

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩)

"আর যারা আল্লাহ'র পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না বরং তারা জীবিত...।" (সূরা আল 'ইমরান, ৩ : ১৬৯)

তারা মৃত্যুবরণ করা সত্ত্বেও, যেটি আল্লাহ'র বাণীতে উল্লেখ রয়েছে -

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ

"প্রত্যেক আত্মাই মৃত্যুর স্বাদ পাবে ...।" (সূরা আল 'ইমরান, ৩ : ১৮৫)

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣٠)

"নিশ্চয়ই তুমিও মারা যাবে আর তারাও মারা যাবে ...।" (সূরা আয- যুমার, ৩৯ : ৩০)

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ (٦٦)

"এবং তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, অতঃপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন, পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন ...।" (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৬৬)

কাজেই ছোট মৃত্যু বড় মৃত্যুর অনুরূপ নয়। ছোট মৃত্যু হল শরীর থেকে আত্মার বিচ্ছেদ, আর বড় মৃত্যু হল শরীর ও আত্মা উভয় থেকেই পুরোপুরিভাবে প্রাণের বিচ্ছেদ। ব্যাপারটি এ কথার মতোই যে, ঘুম হল মৃত্যুর ভাই। আল্লাহ বলেন,

للَّـهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

"তাদের মৃত্যুর সময় আল্লাহ (তাদের) আত্মা হরণ করেন আর যাদের মৃত্যু আসেনি (তাদের আত্মাও হরণ করেন তাদের) ঘুমের সময়। অতঃপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার আত্মা তিনি রেখে দেন আর অবশিষ্টগুলো ফিরিয়ে দেন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।" (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪২)

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুম থেকে জেগে উঠে বলতেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ'র, যিনি আমাদের মৃত্যু ঘটানোর পর আমাদেরকে জীবন দান করেন এবং তার প্রতিই আমাদের পুনরুত্থান ঘটবে।" [২৭]

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত আছে যে তিনি বলতেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহ'র, যিনি আমার শারীরিক অবস্থা ফিরিয়ে দিয়েছেন আর আমার আত্মা ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং তাকে স্মরণ করার জন্য আমাকে অনুমতি দিয়েছেন।" [২৮]

যখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমানোর জন্য শুতেন তখন বলতেন, "হে আল্লাহ, নিশ্চয়ই আপনি আমার আত্মা সৃষ্টি করেছেন, আর আপনি এর প্রাণ নিবেন, এর মৃত্যু ও জীবন তো আপনারই অধিকারভুক্ত। আপনি যদি আমার আত্মাকে জীবিত রাখেন তবে একে রক্ষা করুন, আর যদি এর প্রাণ নেন তবে একে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আমাকে সুস্বাস্থ্য দান করার জন্য।" [২৯]

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলতেন, "হে আল্লাহ, আপনার নাম নিয়ে মারা যাই আর (আপনার নাম নিয়েই) জীবিত হই।" [৩০]

দ্বিতীয় অধ্যায়

অন্তরের একটি অসুস্থতা হল হিংসা করা

কিছু ব্যক্তি হিংসার অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “হিংসা (হাসাদ) হল একটি ক্ষোভ, যা সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির ভালো অবস্থার ব্যাপারে জানার কারনে কোন ব্যক্তির (ভিতর) ঘটে থাকে।”

তাই এ অনুসারে এটি সম্ভব নয় যে, অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার সেই অনুগ্রহগুলোর ব্যাপারে হিংসুক হবে, কারন এই ব্যক্তির তো সে অনুগ্রহগুলো আছেই আর সে অনুগ্রহগুলো সম্পর্কে অভ্যস্ত।

এক দল ব্যক্তি বলেন, “এটি হল যে ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করা হয়, সেই ব্যক্তি থেকে অনুগ্রহ দূর হওয়ার কামনা করা, যদিও হিংসুক ব্যক্তি এই অনুগ্রহগুলোর অনুরূপ অর্জন করে নি।”

এটি “গুতবা” [৩১] (এর অর্থও হিংসা) থেকে ভিন্ন, কারন এটি নির্দেশ করে যে ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করা হয় তাকে প্রদান করা অনুগ্রহ তার থেকে দূর হওয়ার ব্যাপারে কামনা করা ছাড়াই সেই অনুগ্রহের অধিকারী হওয়ার কামনা করাকে।

২.১ হাসাদের প্রকারভেদ

যথাযথভাবে বলতে গেলে হাসাদ (হিংসা) হল ঘৃণা, আর যে ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করা হয় তার ভালো অবস্থাকে অপছন্দ করা। এটি দুই ধরনের –

(১) যে ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করা হয়, তাকে প্রদান করা অনুগ্রহগুলোকে অবাধে অপছন্দ করা। এটি এমন ধরনের হিংসা যা নিন্দার অধীন। যখন একজন ব্যক্তি কোন কিছু ঘৃণা করে তখন সে তার সেই ঘৃণিত বিষয়বস্তুর অস্তিত্বের দ্বারা আহত হয় ও দুঃখ পায়; আর এটি তার অন্তরে এমনই এক অসুস্থতায় পরিণত হয় যে, যে ব্যক্তির ব্যাপারে ঈর্ষা করা হয় সে ব্যক্তি থেকে অনুগ্রহ দূর হলে হিংসুক ব্যক্তি তৃপ্তি পায়, যদিও এর ফলে তার আত্মার বেদনা দূর হওয়া ছাড়া তার কোন লাভ হয় না।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে হিংসা করা হয় সে ব্যক্তিকে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফল ছাড়া এই বেদনা দূর হয় না, যাতে করে অনুগ্রহ দূর হওয়ার পর হিংসুক ব্যক্তি বেদনা থেকে মুক্তি পায়; কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় এই ব্যাপারটা অধিকতর তীব্র হয়ে পড়ে, কারন এটি সম্ভব যে এই অনুগ্রহ বা এর অনুরূপ কিছু সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে যাবে যেটির ব্যাপারে হিংসা করা হয়। এ কারনেই দ্বিতীয় দল ব্যক্তি বলেছেন, “এটি হল অনুগ্রহ দূর হওয়ার কামনা”, কারন নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি নিজের উপর ছাড়া অন্য কারো উপর অনুগ্রহ প্রদান অপছন্দ করে, সে সেগুলো দূর হয়ে যাওয়ার জন্য কামনা করে।

(২) ব্যক্তি তার উপর অন্য কোন ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ হওয়াকে অপছন্দ করে আর সেই ব্যক্তি অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো বা তার চেয়েও অধিকতর উত্তম হওয়ার কামনা রাখে; তাই এটিও এক ধরনের হিংসা, যাকে বলে গুতবা। আল- বুখারি আর মুসলিম বর্ণিত ইবনে মাস‘উদ (রাঃ) ও ইবনে উমার (রাঃ) এর বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায় যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এটিকে হাসাদ বলে উল্লেখ করেছেন।

ইবন মাস’উদ (রাঃ) এর বর্ণনায় রয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “কেবলমাত্র দুটো ব্যাপারেই হিংসা (হাসাদ) করা যায় – সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ তা’আলা সম্পদ দিয়েছেন, এরপর তাকে হক পথে অকাতরে ব্যয় করার ক্ষমতা দেন; সে ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ তা’আলা হিকমত দান করেছেন, এরপর সে তার সাহায্যে ফয়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।” [৩২]

ইবন উমার (রাঃ) বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, “দুটো বিষয় ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে হিংসা (হাসাদ) করা যায় না। একটি হল, আল্লাহ যাকে এই কিতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করেছেন আর সে তদনুযায়ী দিন- রাত আমল করে; আর অপরটি হল, আল্লাহ যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে তা থেকে রাত- দিন (আল্লাহ’র পথে) সাদকা করে।” [৩৩]

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় রয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, “দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কারো সাথে হিংসা (হাসাদ) করা যায় না। এক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তা’আলা কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন আর সে তা দিন- রাত তিলাওয়াত করে, আর তা শুনে প্রতিবেশীরা তাকে বলেন, ‘হায়! আমাদেরকে যদি এরূপ জ্ঞান দেওয়া হতো, যেরূপ জ্ঞান অমুককে দেওয়া হয়েছে, তাহলে আমিও তার মতো আমল করতাম।’ অন্য আরেক ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে সম্পদ সত্য ও ন্যায়ের পথে ব্যয় করে। এ অবস্থা দেখে অন্য এক ব্যক্তি বলে, ‘হায়!

আমাকে যদি অমুক ব্যক্তির মতো সম্পদশালী করা হতো, তাহলে সে যেরূপ ব্যয় করছে আমিও সেরূপ ব্যয় করতাম।' " ৩৪

সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) হাসাদ করা নিষেধ করেছেন, তবে দুটো পরিস্থিতিতে এটি ব্যতিক্রম, যাকে আল- গুতবা বলে নির্দেশ করা হয়। গুতবা'র অর্থ হলঃ একজন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির অবস্থা পছন্দ করা এবং সেই ব্যক্তির সে অবস্থা দূর হওয়ার ব্যাপারে কামনা না রেখেই সেক্ষেত্রে তার তুলনায় সেই ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ থাকাটা অপছন্দ করা।

সুতরাং যদি জিজ্ঞেস করা হয়, "তাহলে এটিকে কেন হিংসা বলা হবে, যখন কিনা সে কেবল এটি ভালবাসে যে আল্লাহ তাকে এই অনুগ্রহগুলো প্রদান করুন ?"

তবে এর জবাবে বলা হবে, "এই ভালোবাসার সূচনা বিন্দু হল কোন ব্যক্তির উপর আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহের দিকে তাকানো আর তার এটি অপছন্দ করা যে সেই ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে। সুতরাং অপর ব্যক্তি যদি উপস্থিত না থাকতো তবে তার সেই অনুগ্রহগুলোর ব্যাপারে কামনা থাকতো না। তাই, যেহেতু এই ভালোবাসার সূচনা বিন্দু ছিল অন্য কোন ব্যক্তির তার অবস্থার উপরে উন্নীত থাকাটা অপছন্দ করা, তাই সেই ভালবাসাটা অপছন্দের অনুসরণ করার কারনে এটিকে বলা হল হিংসা। অবশ্য লোকদের বস্তুগত অবস্থা বিবেচনা করা ছাড়া যদি ব্যক্তি তার উপর আল্লাহ'র অনুগ্রহ কামনা করে তবে এক্ষেত্রে এটি হিংসা হিসেবে বিবেচিত হবে না।"

এ কারনে মানবজাতির অধিকাংশই এই দ্বিতীয় প্রকারের হিংসা করার চেষ্টা করে, যাকে আল- মুনাফাসাহ (প্রতিযোগিতা) ও বলা হয়। কারন দুজন ব্যক্তি একই আকাংখিত বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে, উভয়ই একই উপকার অর্জনের চেষ্টা করে। তাদের সেটি অর্জন করার চেষ্টার কারন হল, দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন এটি অপছন্দ করে যে অপরজন তার উপরে সেই অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে, যেমনটি ঘটে থাকে দুই প্রতিযোগীর মধ্যে যে একজন অপছন্দ করে অপরজন তাকে পরাজিত করবে।

প্রতিযোগিতা করাটা সাধারণভাবে নিন্দনীয় নয়, বরং ধার্মিকতায় প্রতিযোগিতা করাটা প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হবে, গৌরবান্বিত আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)

"নিঃসন্দেহে নেককার লোকেরা মহা নিয়ামতে থাকবে, তারা সুসজ্জিত আসনে বসে (সব) অবলোকন করবে, এদের চেহারায় নিয়ামতের (তৃপ্তি ও) সজীবতা তুমি (সহজেই) চিনতে পারবে; ছিপ আঁটা (বোতল) থেকে এদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানি পান করানো হবে, (পাত্রজাত করার সময়ই) কস্তূরীর সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ (করে দেওয়া হয়েছে); আর এর জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।" (সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ : ২২- ২৬)

সুতরাং (পরকালীন) এসব আনন্দ- উপভোগ অর্জনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করার জন্য আল্লাহ আমাদের আদেশ করেছেন, এই অস্থায়ী দুনিয়ার আনন্দ- উপভোগ অর্জনের প্রতিযোগিতা করার আদেশ দেননি। এটি সম্পূর্ণভাবেই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারন তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংসা করা নিষেধ করেছেন, তবে দুই ধরনের ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটি ব্যতিক্রম - যাকে ইলম প্রদান করা হয়েছে আর সে সেই ইলম অনুযায়ী আমল করে ও তা শিক্ষা দেয়, এবং যাকে ধনসম্পদ প্রদান করা হয়েছে আর সে তা আল্লাহ'র পথে খরচ করে।

এক্ষেত্রে, যাকে ইলম প্রদান করা হয়েছে কিন্তু সে সেই ইলমের উপর আমল করে না, অথবা যাকে ধনসম্পদ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু সে তা আল্লাহ'র আনুগত্যে ব্যয় করে না - এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে হিংসা করা যাবে না আর তার অবস্থা অর্জনের আশাও করা যাবে না; কারন সেই ব্যক্তি এমন ভালো অবস্থায় নেই, যে অবস্থার ব্যাপারে কামনা করা যায়; বরং সে তো শাস্তি সহকারে উপস্থাপিত।

এছাড়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তির ব্যাপারেও হিংসা করার অনুমতি দিয়েছেন, যে ব্যক্তিকে একটি দায়িত্ব প্রদান করার পর সে ইলম ও ন্যায়বিচারের মাধ্যমে সেটি সম্পাদন করে, এর মালিকের আস্থা পূর্ণ করে এবং কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করে।

এ ধরনের ব্যক্তির উঁচু মর্যাদা রয়েছে, কিন্তু এটি কেবল অত্যধিক প্রচেষ্টার (জিহাদ) পরই আসে; আর একই বিষয়টি মুহাজিদ সম্পর্কে সত্য। কিন্তু আত্মা তীব্র কষ্টে থাকা ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করে না। আর এ কারনেই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এটি উল্লেখ করেন নি, যদিও আল্লাহ'র রাস্তায় লড়াই করা মুজাহিদ আল্লাহ'র পথে ধনসম্পদ দান করা ব্যক্তির থেকেও উঁচু মর্যাদায়। এর বিপরীত হল শিক্ষক ও দানকারীর ক্ষেত্রে সত্য, কারন এই দুনিয়াতে তাদের কোন শত্রু নেই। তবে যদি এমন কোন শত্রু থাকতো যার বিরুদ্ধে তাদের জিহাদ করতে হতো, তবে তাদের মর্যাদা এক্ষেত্রে তাদের পূর্বের অবস্থা থেকেও উচ্চতর হবে (অর্থাৎ, যে অবস্থায় তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি, সে অবস্থার তুলনায়)।

একইভাবে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই ব্যক্তির ব্যাপারে উল্লেখ করেননি, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে আর হাজ্জ সম্পাদন করে; কারন এই আমলগুলোর কারনে লোকদের থেকে কোন অনুভবনীয় উপকার অর্জিত হয় না যা দ্বারা ব্যক্তি প্রশংসিত বা নিন্দিত হয়; যেমনটা অর্জিত হয় শিক্ষাদান বা ধনসম্পদ দান করার ক্ষেত্রে।

২.২ হাসাদ ও গুতবার মাঝে

মৌলিকভাবে, হিংসা ঘটে অপর ব্যক্তি ক্ষমতা ও কতৃত্ব অর্জন করলে; নতুবা কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিকে সাধারণত হিংসা করা হয় না, যদিও সেই ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় আরও অধিকতর খাবার, পানীয় ও স্ত্রী পাওয়ার অনুগ্রহ লাভ করে, যা কিনা ক্ষমতা ও কতৃত্ব - এই দুটো অনুগ্রহের বিপরীত, কারন সেগুলো হল অত্যধিক পরিমাণ হিংসার কারন।

এ কারনেই আপনি দেখবেন যে হিংসা পরিচালিত হয় জ্ঞানী লোকদের প্রতি, যাদের লোকজনের মধ্য থেকে অনুসারী রয়েছে; যা আপনি এমন অন্য কোন ব্যক্তিদের দিকে পরিচালিত হতে দেখতে পাবেন না যাদের এমন কোন অনুসারী নেই।

অনুরূপভাবে, সেই ব্যক্তির প্রতিও হিংসা পরিচালিত হয়, যে তার ধনসম্পদ দান করার মাধ্যমে অনুসারীদের আকৃষ্ট করে, কারন লোকেরা এই ব্যক্তির উপকার করে তার অন্তরকে পরিপুষ্ট করার মাধ্যমে আর এই ব্যক্তি লোকদের উপকার করে তাদের শরীরগুলোকে পরিপুষ্ট করার মাধ্যমে; যা এই উভয় বিষয়ে তাদেরকে সংশোধন করবে, আর মানবজাতির সেটির প্রয়োজন রয়েছে। এ কারনেই সকল অসম্পূর্ণতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত মহান আল্লাহ দুটো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন,

ضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّـهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٧٥)

وَضَرَبَ اللَّـهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ۖ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٧٦)

"আল্লাহ (এখানে অপরের) অধিকারভুক্ত একটি দাসের উদাহারন দিচ্ছেন, যে (নিজে থেকে) কোন কিছুই করার ক্ষমতা রাখে না; এবং (উদাহারন দিচ্ছেন) এমন ব্যক্তির (সাথে), যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে চলেছে; (তোমরা কি মনে করো) এরা উভয়েই সমান ? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ'র জন্য, কিন্তু এদের অধিকাংশ মানুষই জানে না।

আল্লাহ আরো দুজন মানুষের উদাহারন দিচ্ছেন, তাদের একজন হল বাকশক্তিহীন - সে কোন কিছুই নিজে থেকে করতে (বা বলতে) পারে না, সে (সব সময়) নিজের মনিবের উপর বোঝা হয়ে থাকে, যেখানেই সে তাকে পাঠায় না কেন, সে কোন ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারে না; এ (অক্ষম) ব্যক্তিটি কি সমান হতে পারে সে ব্যক্তির, যে (নিজে মূক তো নয় বরং) সে অন্য মানুষদের ন্যায়ের নির্দেশ দেয় আর যে আছে সরল পথে ?" (সূরা নাহল, ১৬ : ৭৫- ৭৬)

আল্লাহ এই দুটো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন তার নিজের পবিত্র সত্তা আর তাকে ছাড়া যেটির ইবাদাত করা হয় সেটির জন্য। কারন, নিঃসন্দেহে মূর্তির কোন কাজ করারই সামর্থ্য নেই যে এটি কারো উপকার করবে, আর এর না আছে কোন কিছু বলার সামর্থ্য যে সেটির মাধ্যমে উপকার করবে। সুতরাং, কারো অধিকারে থাকা একজন সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন দাস (অর্থাৎ, মূর্তি) এবং আরেকজন দাস যাকে আল্লাহ প্রচুর রিযক দিয়েছেন যা থেকে সে প্রকাশ্য ও গোপনে দান করে; যে দাস উপকার করতে অক্ষম এবং যে দাস গোপনে ও প্রকাশ্যে লোকদের উপকারে সক্ষম; তবে কি উপকারে অক্ষম দাস এবং গোপনে ও প্রকাশ্যে লোকদের জন্য উপকারে সক্ষম দাস - এরা উভয়ে কখনো সমান হতে পারে ? এবং সকল ধরনের ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত আল্লাহ তার দাসদের উপর কল্যাণ প্রদানে সক্ষম এবং তিনি ক্রমাগত সেটিই করে যাচ্ছেন। সুতরাং কিভাবে এই অক্ষম দাস (অর্থাৎ, মূর্তি), যে কিনা কিছুই করতে সক্ষম নয়, তাকে আল্লাহ'র সাথে এরূপে তুলনা করা হয় যে আল্লাহ'র পাশাপাশি সেটির ইবাদাত করা হবে ? সুতরাং এটি হল এক ব্যক্তির দৃষ্টান্ত, যাকে আল্লাহ ধনসম্পদ প্রদান করেছেন, যা থেকে সে দিন- রাত ব্যয় করে।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুটো ব্যক্তিকে বিবেচনা করা হয়েছে, এদের একজন হল বাকশক্তিহীন। সে না পারে বুঝতে আর না পারে কথা বলতে, এবং সে কিছুই করতে সক্ষম নয় আর প্রকৃতপক্ষে সে তার মনিবের উপর একটি বোঝা; কারন মনিব যে পথে তাকে নির্দেশ করে সে কোন কল্যাণ নিয়ে আসতে পারে না, তাই সে একেবারেই কোন কাজের নয়। অপর ব্যক্তি হলেন একজন ন্যায়পরায়ণ আলিম, যিনি ন্যায়ের আদেশ করেন আর ন্যায়সঙ্গতভাবে কাজ করেন, আর সরল পথের উপর অবস্থান করেন। এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতোই, যার উপর আল্লাহ হিকমত প্রদান করেন এবং তিনি তা অনুযায়ী আমল করেন ও তা শিক্ষা দেন। আল্লাহ তার নিজের জন্য এই দৃষ্টান্তটি উপস্থাপন করেছেন, কারন তিনিই হলেন সর্বজ্ঞানী, সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আর তিনি ন্যায়পরায়ণের আদেশ করেন। তিনি তার সৃষ্টিকে সরল পথের উপর ন্যায়পরায়নতার সাথেই প্রতিপালন করছেন, যেমনটি তিনি বলেন,

شَهِدَ اللَّـهُ أَنَّهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (١٨)

"(স্বয়ং) আল্লাহ সাক্ষী দিচ্ছেন যে তিনি ছাড়া আর অন্য কোন ইলাহ নেই, ফেরেশতারা আর জ্ঞানবান লোকেরাও (এই একই সাক্ষ্য দিচ্ছে), একমাত্র আল্লাহই ন্যায় ও ইনসাফ কার্যকর করেন, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা আল ইমরান, ৩ : ১৮)

এবং হুদ (আঃ) বলেছিলেন -

إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٦)

"নিশ্চয়ই আমার রব সরল পথের উপর রয়েছেন।" (সূরা হুদ, ১১ : ৫৬)

এ কারনেই লোকেরা আল- ‘আব্বাসের ঘরের প্রশংসা করতোঃ ‘আবদুল্লাহ লোকদের শিক্ষাদান করতেন আর তার ভাই তাদেরকে খাবার খাওয়াতেন, তাই লোকেরা এ কারনে তাদের প্রশংসা করতো।

মুওাওিয়াহ দেখলেন যে লোকেরা ইবন উমারকে হাজ্জের নিয়মকানুন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে আর ইবন উমার তাদেরকে ফাতওয়া দিলেন, এটি দেখে মুওাওিয়াহ বললেন, “আল্লাহ কসম, এটিই হল মর্যাদা” অথবা অনুরূপ কিছু।

২.৩ আস- সিদ্দিক (রাঃ) এবং ‘উমার (রাঃ) এর মধ্যে প্রতিযোগিতা

সাদকা করার ব্যাপারে আবু বকর (রাঃ) এর সাথে ‘উমার বিন আল- খাত্তাব (রাঃ) এর প্রতিযোগিতার ব্যাপারটি জানা যায় সাহিহ বুখারিতে বর্ণিত ‘উমার বিন আল- খাত্তাব (রাঃ) এর হাদিস থেকে।

তিনি বলেন, “রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে সাদকা করার আদেশ দিলেন, তাই আমি আমার অধিকারে থাকা সম্পদগুলো একত্রিত করলাম। আমি নিজেকে বললাম, ‘যদি এমন কোন দিন আসে, যেদিন আমি আবু বকরের থেকে অধিকতর উত্তম হতে পারবো, তবে এটিই সেই দিন।’ এরপর আমি আমার সম্পদের অর্ধেক সাথে করে নিয়ে গেলাম আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছো ?’ আমি জবাব দিলাম, ‘একই পরিমাণ সম্পদ’। এরপর আবু বকর তার অধিকারে থাকা সব সম্পদ নিয়ে আসলেন। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমার পরিবারের জন্য তুমি কি রেখে এসেছো ?’ তিনি জবাব দিলেন, ‘আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে রেখে এসেছি।’ আমি এরপর আবু বকরকে বললাম, ‘আমি কখনোই কোন কিছুতে আপনার থেকে অধিকতর উত্তম হতে পারবো না।’ ”

সুতরাং হাদিস থেকে জানা যায় যে, ‘উমার (রাঃ) আবু বকর (রাঃ) এর সাথে প্রতিযোগিতা করলেন আর তিনি অনুমোদিত হিংসা (গুতবা) ও করলেন, কিন্তু আবু বকর আস- সিদ্দিক (রাঃ) এর অবস্থা তার তুলনায় উত্তম ছিল। এভাবেই আবু বকর (রাঃ) অন্যদের অবস্থার প্রতি তার অনাসক্তির কারনে সাধারণত এই ধরনের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতেন।

২.৪ মুসা (আঃ) গুতবা প্রদর্শন করেছিলেন

মুসা (আঃ) এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিলো। মিরাজের হাদিস থেকে জানা যায় যে মুসা (আঃ) প্রতিযোগিতা করেছিলেন আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ব্যাপারে হিংসা অনুভব করেছিলেন -

"রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) মিরাজের রাতে তাকে অতিক্রম করে যাওয়ার সময় তিনি কেঁদে উঠলেন। তাকে কাঁদার কারন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিলেন, 'আমি কাঁদছি কারন আমার পর আল্লাহ'র এমন একজন গোলামকে পাঠানো হবে যার উম্মাত আমার উম্মাতের থেকে বেশী পরিমানে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' " [৩৫]

সাহিহ- তে ছাড়াও এই হাদিসটি ভিন্ন বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে -

"আমরা একজন ব্যক্তিকে অতিক্রম করলাম, যখন তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, 'আপনি তাকে অনুগ্রহ দান করেছেন আর তাকে (আমার উপর) সম্মান দিয়েছেন।' সুতরাং আমরা তার কাছে গেলাম আর তাকে আমাদের সালাম দিলাম। তিনি আমাদের সালামের জবাব দিয়ে বললেন, 'হে জিবরাঈল, আপনার সাথে ইনি কে ?' তিনি জবাব দিলেন, 'ইনি হলেন আহমাদ।' মুসা (আঃ) বললেন, 'স্বাগতম হে নিরক্ষর নবী, যিনি তার রবের বানী বহন করলেন আর আন্তরিকভাবে তার জাতিকে উপদেশ দিলেন।' এরপর আমরা এগুতে লাগলাম। আমি বললাম, 'হে জিবরাঈল, ইনি কে ছিলেন ?' তিনি জবাব দিলেন, 'ইনি ছিলেন মুসা বিন 'ইমরান।' আমি বললাম, 'আর তিনি কার কাছে অনুযোগ করছিলেন ?' তিনি জবাব দিলেন, 'তিনি আপনার সম্পর্কে আপনার রবের কাছে অনুযোগ করছিলেন।' আমি বললাম, 'তার রবের প্রতি তিনি তার স্বর উঁচু করলেন ?' তিনি জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সত্যবাদিতা সম্পর্কে জানতেন।' "

সুতরাং উমার (রাঃ) এর ব্যাপারটিও মুসা (আঃ) এর অনুরূপ। আমাদের রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অবস্থা মুসা (আঃ) এর থেকেও শ্রেষ্ঠত্বর হওয়ার কারনে তাকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন অনুমোদিত হিংসা আচ্ছন্ন করেনি।

২.৫ উঁচু মর্যাদা বিশিষ্ট ব্যক্তি গুতবা থেকে সুরক্ষিত

অনুরূপভাবে, সাহাবীদের মধ্য থেকে আবু 'উবাইদাহ বিন জাররাহ (রাঃ) আর তার মতো অন্যান্য সাহাবীরা এই ধরনের চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার কারনে তারা সে সকল ব্যক্তি থেকে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ ছিলেন, যারা প্রতিযোগিতা করতেন আর গুতবা প্রদর্শন করতেন, যদিও এটি প্রদর্শন করা অনুমোদিত। এ কারনেই আবু উবাইদাহ (রাঃ) "এই উম্মাহ'র একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি" [৩৬] হিসেবে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। কারন বিশ্বস্ত ব্যক্তির যদি কোন প্রতিযোগিতা না থাকে আর যেটি তাকে ন্যস্ত করা হয় সেটির জন্য তার নিজের মধ্যে কামনা না থাকে, তবে বিশ্বাস করার ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। যে ব্যক্তি বৃহত্তর বিষয়গুলোতে কোন প্রতিযোগিতা করার ব্যাপারে আচ্ছন্ন না হওয়ার ব্যাপারে পরিচিত, ক্ষুদ্রতর বিষয়গুলোও তাকে ন্যস্ত করা হয়; আর যে ব্যক্তির পক্ষে ধনসম্পদ থেকে চুরি করার কোন কারন নেই, তাকে ধনসম্পদের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা খুঁজে পায় যার সাদৃশ্য হল ভেড়ার দায়িত্ব পাওয়া নেকড়ের ন্যায়, তবে তাকে যেটি ন্যস্ত করা হয়েছে সেটির জন্য তার অন্তরে কামনা থাকার কারনে যে ব্যাপারে তার উপর আস্থা রাখা হয়েছে তা সে সম্পাদন করতে পারবে না।

ইমাম আহমাদের মুসনাদে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেনঃ আমরা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, "এখন তোমাদের সামনে একজন জান্নাতী ব্যক্তি উপস্থিত হবে।" কিছুক্ষন পর এক আনসারী ব্যক্তি বাম হাতে তার জুতো ধরে নতুনভাবে উযু করা অবস্থায় উপস্থিত হলেন। তার দাঁড়ি থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় উযুর পানি ঝরছিল। দ্বিতীয় দিনও আমরা অনুরূপভাবে বসেছিলাম, তখনো তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সেই কথাই বললেন আর ওই লোকটি সেই একইভাবে আসলেন। তৃতীয় দিনও সেই একই ব্যাপার ঘটলো।

অতঃপর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন থেকে উঠে গেলেন, তখন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল 'আস (রাঃ) তার পিছু নিলেন। তাকে তিনি বললেন, "জনাব, আমার আর আমার পিতার মধ্যে কিছু বাদানুবাদ হয়েছে। তাই আমি শপথ করে বসেছি যে তিন দিন পর্যন্ত আমি বাড়িতে প্রবেশ করবো না। সুতরাং যদি দয়া করে আমাকে অনুমতি দেন তবে এই দিনগুলো আমি আপনার বাড়িতে কাটিয়ে দিবো।" তিনি বললেন, "বেশ, ঠিক আছে।"

সুতরাং তিন দিন আমি তার সাথে তার বাড়িতে অতিবাহিত করলাম। দেখলাম যে তিনি রাতে তাহাজ্জুদের সালাতও আদায় করলেন না। শুধু এতটুকু করলেন যে, জেগে উঠে বিছানায় শুয়ে শুয়েই আল্লাহ'র যিকর ও তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে থাকলেন। হ্যা, তবে এটি অবশ্যই ছিল যে, আমি তার মুখে ভালো কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিনি।

তিন রাত অতিবাহিত হলে তার আমল আমার কাছে হালকা লাগলো। অতঃপর আমি তাকে বললাম, "জনাব, আমার ও আমার পিতার মধ্যে কোন বাদানুবাদ হয়নি এবং অসন্তুষ্টির কারনে আমি বাড়িও ছাড়িনি। বরং প্রকৃত ব্যাপার এই যে, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর্যুপরি তিন দিন বললেন যে, এখনই একটি জান্নাতি লোক আসবে, আর তিন দিনই আপনার আগমন ঘটে। তাই আমি ইচ্ছা করলাম কয়েকদিন আপনার সাহচর্যে আমি কাটিয়ে দিবো। এরপর এটি লক্ষ্য করবো আপনি এমন কি আমল করেন যার কারনে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবিতাবস্থাতেই আপনার জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ আমাদেরকে প্রদান করলেন। তাই আমি এই কৌশল অবলম্বন করলাম এবং তিন দিন পর্যন্ত আপনার খেদমতে থাকলাম, যেন আপনার আমল দেখে আমিও ঐরূপ আমল করে জান্নাতবাসী হতে পারি। কিন্তু আমি তো আপনাকে কোন নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ আমল করতে দেখলাম না আর ইবাদাতেও

তো অন্যদেরকে ছাড়িয়ে যেতে দেখলাম না। এখন আমি আপনার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছি। কিন্তু বিদায় বেলায় আমি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, এমন কি আমল করেন যে যার কারনে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার জান্নাতি হওয়ার কথা বললেন ?"

উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, "আপনি আমাকে যে আমল করতে দেখেছেন এটি ছাড়া অন্য কোন বিশেষ ও গোপনীয় আমল আমি করি না।"

তার এ জবাব শুনে আমি তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে চলতে শুরু করলাম। অল্প দূরে গিয়েছি, ইতিমধ্যে তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "আমার একটি আমল রয়েছে, সেটা এই যে, আমি কখনো কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা পোষণ করিনি আর কখনো কোন মুসলমানের অমঙ্গল কামনা করিনি।"

আমি তার কথা শুনে বললাম, "হ্যা, এবার আমার জানা হয়ে গেছে যে, আপনার এই আমলই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। আর এটি তো এমনই এক আমল যে, অনেকেই এটির ক্ষমতা রাখে না।"

সুতরাং আবদুল্লাহ বিন আমর তাকে যা বললেন - "হ্যা, এবার আমার জানা হয়ে গেছে যে, আপনার এই আমলই আপনাকে এই মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছে। আর এটি তো এমনই এক আমল যে, অনেকেই এটির ক্ষমতা রাখে না।" - এটি নির্দেশ করে যে, তার মধ্যে হিংসার অনুপস্থিতি ছিল আর তিনি সব ধরনের হিংসা থেকে নিরাপদ ছিলেন। এ কারনেই আল্লাহ আনসারদের ব্যাপারে প্রশংসা করে বলেছেন -

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

"...এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাংখা পোষণ করে না, আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও...।" (সূরা হাশর, ৫৯ : ৯)

এর অর্থ হল আনসারদের মুহাজির ভাইদেরকে যা দেওয়া হয় সেটি। মুফাসসিররা বলেছেন, "মুহাজিরদের যা প্রদান করা হয় সে ব্যাপারে তাদের (আনসারদের) অন্তরে হিংসা ও ঘৃণা থাকে না।" মুফাসসিরদের মধ্যে কেউ বলেন, "ফাই এর মাল থেকে তাদের যা প্রদান করা হয়।" আর অন্যান্যরা বলেছেন, "তাদেরকে যে প্রাধান্য ও অনুগ্রহ প্রদান করা হয়।"

সুতরাং মুহাজিরদের যে ধনসম্পদ আর মর্যাদা দেওয়া হয় সেগুলোর ব্যাপারে তারা কোন প্রয়োজন খুঁজেন না, যদিওবা এই ধরনের ব্যাপারগুলোতে হিংসা জাগ্রত হয়।

আওস আর খাজরাজ গোত্রের মধ্যে দ্বীনের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা হতো, যেমন - যদি এদের একটি গোত্র এমন কিছু করে যেটির কারনে তারা আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে, তবে

অপর গোত্রও একই কাজ করার ব্যাপারে কামনা রাখতো। সুতরাং এটি ছিল এমনই এক প্রতিযোগিতা যা তাদেরকে আল্লাহ’র নিকটবর্তী করতো। আল্লাহ বলেন,

وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (٢٦)

“এবং এর জন্য প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।” (সূরা মুতাফফিফিন, ৮৩ : ২৬)

২.৬ নিন্দনীয় হিংসা

সম্পূর্ণভাবেই নিন্দিত হিংসার ব্যাপারে উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ ইয়াহুদিদের সম্পর্কে বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ

"কিতাবিদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্নিহিত হিংসার কারনে (তোমরা) বিশ্বাস স্থাপনের পর তোমাদেরকে অবিশ্বাসী করার কামনা করে...।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৯)

"তারা কামনা করে" এর অর্থ হল, তারা হিংসা বশতঃ তোমাদেরকে দ্বীন ত্যাগ করানোর আশা করে। সুতরাং সত্য তাদের নিকটে পরিস্কার হয়ে যাওয়ার পরও তাদের এই কামনার পিছনে সিদ্ধান্তের প্রকৃত বাস্তবতা ছিল হিংসা। এর কারন হল, যখন তারা দেখলো যে আপনারা এমন কিছু অনুগ্রহ অর্জন করছেন যা তারা প্রকৃতপক্ষে কখনোই অর্জন করেনি, তখন তারা আপনাদের ব্যাপারে হিংসুকে পরিণত হয়। অনুরূপভাবে আরেকটি আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে –

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا (٥٤) فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۚ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا (٥٥)

"তবে কি লোকদের প্রতি এ জন্য তারা হিংসা করে যে আল্লাহ তাদেরকে নিজের সম্পদ থেকে কিছু দান করেছেন ? ফলতঃ নিশ্চয়ই আমি ইব্রাহীম বংশীয়গণকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি এবং তাদেরকে বিশাল সাম্রাজ্য প্রদান করেছি। অনন্তর তাদের মধ্যে অনেকেই ওর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর অনেকেই ওটা থেকে বিরত রয়েছে; এবং (তাদের জন্য) শিখা বিশিষ্ট জাহান্নামই যথেষ্ট।" (সূরা নিসা', ৪ : ৫৪-৫৫)

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِن شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

"বলঃ আমি উজ্জ্বল প্রভাতের রবের কাছে আশ্রয় চাই; (আশ্রয় চাই) তার সৃষ্টি করা (প্রতিটি জিনিষের) অনিষ্ট থেকে; আমি আশ্রয় চাই রাতের (অন্ধকারে সংঘটিত) অনিষ্ট থেকে, (বিশেষ করে) যখন রাত তার অন্ধকার বিছিয়ে দেয়; (আমি আশ্রয় চাই) গিরায় ফুঁক দিয়ে যাদুটোনাকারিণীদের অনিষ্ট থেকে; হিংসুক ব্যক্তির (সব ধরনের হিংসার) অনিষ্ট থেকেও (আমি আপনার আশ্রয় চাই) যখন সে হিংসা করে।" {সূরা ফালাক, ১১৩ : ১-৫}

একদল মুফাসসির উল্লেখ করেছেন, এই সূরাটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ইয়াহুদিদের হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল করা হয়। তারা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি এতই হিংসুটে ছিল যে তারা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর যাদু করতো। ইয়াহুদি লাবিদ বিন আল- 'আসাম যাদুর কাজ করতো। [৩৭]

সুতরাং যে হিংসুক ব্যক্তি কারো উপর আল্লাহ প্রদত্ত অনুগ্রহকে ঘৃণা করে, সে তার হিংসার কারনে সীমা অতিক্রম করে; সে একজন যালিম। যে ব্যক্তি অন্য কারো অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়াটা অপছন্দ করে অথচ সে একইভাবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়ার কামনা করে, তার জন্য এটি করাটা নিষিদ্ধ, তবে সেটি ছাড়া - যা তাকে আল্লাহ'র নিকটবর্তী করবে। সুতরাং ব্যক্তি যদি এমন কিছুর কামনা করে যা অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে, যেটি কিনা তাকে আল্লাহ'র নিকটবর্তী হতে সাহায্য করবে - তবে এতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি তার অন্তরে অন্য কোন ব্যক্তির অবস্থার প্রতি না তাকিয়ে সেই অনুগ্রহের জন্য কামনা করে, তবে সেটিই হবে অধিকতর উত্তম আর অধিকতর চমৎকার।

এ ব্যক্তি যদি এই হিংসা কতৃক প্ররোচিত হয়ে আমল করে, তবে সে সীমা অতিক্রম করে যালিমে পরিণত হবে আর শাস্তির যোগ্য হবে যদি সে তাওবা না করে। সুতরাং হিংসুক দ্বারা প্রভাবিত ব্যক্তি নিপীড়িত এবং তাকে সবর ও তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। হিংসুক কতৃক সে যে ক্ষতি দ্বারা প্রভাবিত হবে সেটির উপর তাকে সবর অবলম্বন করতে হবে এবং তার উচিত হবে ক্ষমা করে দেওয়া ও উপেক্ষা করা। আল্লাহ বলেন,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّـهُ بِأَمْرِهِ ۗ

"কিতাবিদের অনেকে তাদের প্রতি সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর তারা তাদের অন্তর্নিহিত হিংসার কারনে (তোমরা) বিশ্বাস স্থাপনের পর তোমাদেরকে অবিশ্বাসী করার কামনা করে, কিন্তু যে পর্যন্ত আল্লাহ স্বয়ং আদেশ আনয়ন না করেন সে পর্যন্ত তোমরা ক্ষমা ও উপেক্ষা করতে থাকো।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৯)

প্রকৃতপক্ষে ইউসুফ (আঃ) ও তার ভাইদের হিংসার শিকার হয়েছিলেন –

إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا

"যখন তারা (একজন আরেকজনকে) বললো, 'আমাদের পিতার কাছে নিঃসন্দেহে ইউসুফ আর তার ভাই (বিনইয়ামীন) আমাদের চেয়েও বেশী প্রিয়...।' " (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৮)

সুতরাং এই দুই ভাইকে তাদের পিতা তাদের অন্যান্য ভাইদের চেয়ে বেশী দয়া দেখানোর কারনে তাদের ভাইয়েরা তাদের দুজনের ব্যাপারে হিংসাবোধ করেছিল। এ কারনেই পিতা ইয়াকুব (আঃ) তার পুত্র ইউসুফ (আঃ) কে বললেন,

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٥)

"সে বললোঃ হে আমার পুত্র, তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না, (তা) করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৫)

তার ভাইয়েরা তাকে হত্যা করার ব্যাপারে আলোচনা করা আর তাকে কূপে ফেলে দেওয়ার মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে যুলুম করলো। এরপর তাকে যে ব্যক্তি গোলাম হিসেবে কিনে নেয় সে ব্যক্তি ইউসুফ (আঃ) কে কাফিরদের ভুমিতে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে সেই কাফির লোকগুলো তার মালিকানা লাভ করে। এভাবে নিপীড়িত হওয়ার পর ইউসুফ (আঃ) কে এক মহিলা অশ্লীল কাজে আহবান করলো আর তাকে সে কাজে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলো এবং যারা এ কাজে তাকে সাহায্য করতে পারবে সে মহিলা তাদের কাছে এই কাজে সাহায্য চেয়েছিল, কিন্তু ইউসুফ (আঃ) এটি থেকে নিরাপদ ছিলেন। সেই অশ্লীল কাজ করার পরিবর্তে তিনি কারারুদ্ধ হওয়াকেই বেছে নিলেন, আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করে পরকালের শাস্তির পরিবর্তে এই পার্থিব জগতের শাস্তিই পছন্দ করলেন আর প্রাধান্য দিলেন।

সুতরাং তিনি নির্যাতিত হলেন এমন একজন দ্বারা, যে নিজের নিকৃষ্ট কামনা আর অসৎ উদ্দেশ্যের কারনে তাকে কামনা করেছিলো। সুতরাং যে ভালোবাসা দ্বারা সে ইউসুফ (আঃ) কে কামনা করেছিলো, সেটি তার অন্তরের নিরর্থক কামনার প্রতি নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার কারন হিসেবে জাগ্রত হয়েছিলো। আর সেই অন্তরের সুখ বা বিষণ্ণতা নির্ভর করেছিলো ইউসুফ (আঃ) কতৃক সেই প্রলোভন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার উপর।

ইউসুফ (আঃ) তাদের দ্বারাও জুলুমের শিকার হয়েছিলেন যারা অন্তরে তার প্রতি এমন ঘৃণা রেখে তাকে ঘৃণা করেছিলো, যার কারনে তাকে কূপে পতিত হতে হয়েছিলো। এরপর তিনি বন্দী হলেন আর মালিকানাধীন হলেন তার নিজের ইচ্ছা ছাড়াই, এ কারনে সেই লোকেরা তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা থেকে সরিয়ে রাখে। মিথ্যা উপাসকদের দাসত্ব করার জন্য তাকে

জোর করা হয়েছিলো; এটি তাকে বাধ্য করেছিল ইচ্ছাকৃতভাবে কারাগারে আশ্রয় নেওয়ার জন্য, যার ফলে তার পরীক্ষা আরও বিশাল হয়ে পড়ে।

এই ঘটনায় তার সবর জাগ্রত হয় তার নিজের ইচ্ছাবশত, যা আল্লাহ'র ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বনের সাথে জড়িত ছিল। এভাবে তাদের ভিন্ন নির্যাতনের সামনে তার ভিন্ন ধরনের সবর দেখা যায়, যেগুলো ছিল দুঃখ দুর্দশার শুরুতেই সবর অবলম্বন করা। যদি কোন ব্যক্তি এগুলোর অনুরূপ সবর অবলম্বন করতে না পারে তবে সে নিছকই পশুদের পথ ও পদ্ধতি গ্রহণ করবে।

এই দ্বিতীয় ধরনের সবর জাগ্রত হয় ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা থেকে। এটি দুই ধরনের সবর থেকে অধিকতর চমৎকার। এ কারনেই আল্লাহ বলেন,

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠)

"যে ব্যক্তি মুত্তাকী ও সবরকারী, আল্লাহ সেরকম সৎ কর্মপরায়ণদের শ্রমের ফল নষ্ট করেন না।" (সূরা ইউসুফ, ১২ : ৯০)

অনুরূপভাবে, যখন একজন মুসলিম তার ঈমানের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তার থেকে কুফর, সীমালঙ্ঘন ও অবাধ্যতা চাওয়া হলে যদি সে তা গ্রহণ না করে তবে তার ক্ষতি করা হবে আর শাস্তি দেওয়া হবে, এমন অবস্থায় তার উচিত হবে তার দ্বীন ত্যাগ না করে এই ক্ষতি আর শাস্তিকে বেছে নেওয়া, এমনকি তাকে যদি এটির কারনে কারাদণ্ড পেতে হয় বা তার ভুমি থেকে তাকে নির্বাসনে পাঠানো হয় তবুও; যেমনটা ঘটেছিলো মুহাজিরদের ক্ষেত্রে – তারা তাদের দ্বীন ইসলাম ত্যাগ করার পরিবর্তে তাদের উপনিবেশ ত্যাগ করেছিলেন, যেটির জন্য তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে আর শাস্তিপ্রাপ্ত হতে হয়েছিলো।

রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিভিন্ন উপায়ে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছিলো, কিন্তু তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সবর অবলম্বনের ইচ্ছাবশত সম্পূর্ণরূপেই সবর অবলম্বন করেছিলেন; আর এটি করার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন কেবল এটির জন্য যে তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজ ইচ্ছাবশত তা করেছিলেন।

সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সবর ইউসুফ (আঃ) এর সবরের থেকেও অধিকতর মহান। কারন ইউসুফ (আঃ) থেকে কেবল একটি অশ্লীল কাজ চাওয়া হয়েছিলো আর তিনি এতে অসম্মত হওয়ায় কেবল তখনই কারাবন্দী হওয়ার মাধ্যমে শাস্তি পেলেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছিলো কুফর। যখন তারা এটি করলেন না, তখন তাদেরকে হত্যা ও অনুরূপ ক্ষতির মাধ্যমে শাস্তি দেওয়া হয়েছিলো আর ন্যূনতম শাস্তি ছিল বন্দী ও অবরুদ্ধ করে রাখা। মুশরিকেরা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর বানু হাশিমকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পাহাড়ের গিরিপথে অবরোধ করে রেখেছিলো। আর আবু তালিবের মৃত্যুর পর তো তারা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিরুদ্ধে আরও বেশী কঠোর হয়ে যায়। আনসাররা যখন তাকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বাইয়াত (আনুগত্যের শপথ) প্রদান করেন আর যখন মুশরিকেরা এটি জানতে পারে, তখন তারা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মক্কা

থেকে মদিনায় হিজরত না করার জন্য প্রতিরোধের চেষ্টা করলো এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলো। এরপর 'উমার বিন আল- খাত্তাব (রাঃ) এর মতো কিছু সাহাবী ছাড়া সবাই গোপনে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করলেন।

সুতরাং, মুসলিমের উপর যা আপতিত হয় সেটি হল আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আনুগত্যকে বেছে নেওয়ার ফলাফল। এগুলো এমন কোন দুর্দশা নয় যা আল্লাহ'র গোলামের নিজ থেকে বেছে নেওয়া ছাড়াই ঘটে, যেমনটা ঘটেছিল ইউসুফ (আঃ) এর সাথে আর তার পিতা থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার ঘটনার ন্যায়। সুতরাং একজন মুসলিমের এই ধরনের অবলম্বন করা সবর হল দুই ধরনের সবরের মধ্যে অধিকতর উঁচু, আর পদমর্যাদার দিক থেকে এই ধরনের সবরকারী ব্যক্তি অধিকতর শ্রেষ্ঠ।

যে ব্যক্তি তার ইচ্ছা ছাড়াই পরীক্ষায় পতিত হবে, সে তার সবর ও তাকদিরের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকার জন্য পুরস্কৃত হবে আর তার পাপগুলোর প্রায়শ্চিত্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ'র আনুগত্য করাকে বেছে নেওয়ার কারনে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে বাস্তব দুর্দশার জন্য পুরস্কৃত হবে আর তার জন্য এটি সৎ কাজ হিসেবে লেখা হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١٢٠)

"এটির (অর্থাৎ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গী হওয়ার প্রয়োজনীয়তার) কারন এই যে, আল্লাহ'র পথে তাদের যে পিপাসা দেখা দেয়, যে ক্লান্তি স্পর্শ করে, আর যে ক্ষুধা পায়, আর তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধের কারন হয়ে থাকে, আর দুশমনদের থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয় – এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে তাদের জন্য এক একটি নেক আমল লিপিবদ্ধ হয়ে যায়, নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎ কর্মশীল লোকদের পুণ্যফল বিনষ্ট করবেন না।" (সূরা তাওবাহ, ৯ : ১২০)

এটি হল সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিপরীত, যাকে পরীক্ষা করা হয় তার নিজ থেকে ইচ্ছা করা ছাড়াই, যেমন - অসুস্থ হওয়া, মৃত্যুবরণ করা বা তার কাছ থেকে কিছু চুরি হয়ে যাওয়া; তবে এই ব্যক্তি কেবল তার সবরের জন্য পুরস্কৃত হবে, বাস্তবে ঘটে যাওয়া দুর্দশার জন্য নয় আর এ থেকে যে ফল আসে সেটির জন্যও নয়।

আর যেসব ব্যক্তি আল্লাহ'র প্রতি তাদের ঈমানের কারনে এবং আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি আনুগত্যের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; আর এর ফলে কষ্টে পতিত হয়, অসুস্থ হয়, বন্দী বা অবরুদ্ধ হয়, তাদের ভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, তাদের সম্পদ ও পরিবার তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়, প্রহার ও অপব্যবহার করা হয়, অথবা তাদের অবস্থা ও সম্পদ খর্ব করা হয়; তবে তারা নবীদের আর তাদের অনুসারীদের পথের উপরই থাকেন যেমনটি ছিলেন মুহাজিরগণ।

তাই যেগুলোর কারনে এসব ব্যক্তির ক্ষতি হয়েছে, সেগুলোর কারনে তারা পুরস্কৃত হবেন আর এর কারনে তাদের জন্য একটি সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করা হবে, যেমনটি একজন মুজাহিদ পুরস্কৃত হোন ক্ষুধা লাগা, পিপাসিত হওয়া আর দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার ফলে অবসাদের শিকার হওয়ার জন্য আর কাফিরদেরকে ক্ষিপ্ত করে দেওয়ার জন্যও, যদিও এর প্রভাব এমন কিছু না হয় যা সে শারীরিকভাবে প্রদর্শন করে; কিন্তু তার জিহাদ করার ক্রিয়া থেকে সেগুলো ফলপ্রাপ্ত হয়, যা কিনা সে করতে পছন্দ করেছে।

এ ব্যাপারে মতভিন্নতা আছে যে, এটি কি বলা যাবে যে, এ প্রভাবগুলোর জন্য এগুলোর পরিণতি হিসেবে প্রাপ্ত ফলাফলগুলো কারন সম্পর্কিত কর্ম সম্পাদনকারীর কর্ম, নাকি এগুলো আল্লাহ'র কর্ম, অথবা নাকি সেগুলোর কোন কর্ম সম্পাদনকারী নেই ? সঠিক মত হল এই যে, সেগুলো কারন সম্পর্কিত কর্ম সম্পাদনকারী আর কারনসমূহের সাকল্যে কর্ম সম্পাদনকারীর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে, আর এ কারনেই তার জন্য একটি সৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করা হয়।

এই আলোচনার পিছনে উদ্দেশ্য হল, হিংসা করা অন্তরের অন্যতম অসুস্থতা আর এটি এমন এক ব্যাধি যা মানবজাতির অধিকাংশকেই পীড়িত করে এবং কেবল অল্প কিছু ব্যক্তি এ থেকে নিরাপদে থাকতে পারেন। এ কারনেই বলা হয়ে থাকে, "শরীর তো কখনোই হিংসা থেকে মুক্ত নয়, কিন্তু হীনতা একে বের করে নিয়ে আসে আর মহত্ত্ব একে গোপন করে রাখে।"

আল হাসান আল বাসরি কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, "একজন মুসলিমকে কি হিংসা করা যায় ?" তিনি জবাব দিলেন, "কিসে আপনাকে ভুলিয়ে দিলো ইউসুফ (আঃ) আর তার ভাইদের কথা, আপনার কি পিতা নেই ? আপনার উচিত হল হিংসার উদ্রেক হলে সেটিকে আপনার অন্তরে অন্ধ করে রাখা। কারন আপনি সেটি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না যেটি আপনি বলার বা করার মাধ্যমে সম্পাদন করবেন না।"

২.৭ হিংসার চিকিৎসা

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে এমন অবস্থায় পায় যে, সে তার আত্মায় কারো প্রতি হিংসার আশ্রয় দিয়েছে, তবে তার দায়িত্ব হল সবর ও তাকওয়ার দ্বারা এর চিকিৎসা করা আর তার আত্মায় এটি থাকাটা অপছন্দ করা। যে ব্যক্তিকে হিংসা করা হয়, অনেক ধার্মিক ব্যক্তিই তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন না, আর না তারা সাহায্য করেন সে ব্যক্তিকে যে তার উপর যুলুম করে, না তারা তার ন্যায্য সম্পর্কিত আবশ্যকর্তব্য প্রতিষ্ঠা করে। বরং হিংসা করা হয় এমন ব্যক্তিকে যখন কেউ তিরস্কার করে, তখন তারা সেই ব্যক্তির সাথে একমত হয় না বা তাকে তিরস্কারে সাহায্যও করে না, আর না তারা তার প্রশংসনীয় গুণাবলীর উল্লেখ করে। অনুরূপভাবে, কেউ যদি তার প্রশংসা করে তবে তারা নীরব থাকে।

সুতরাং এই ব্যক্তিগুলো যে ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করা হয়, তার ন্যায্য সম্পর্কিত হুকুম ত্যাগ করার জন্য দায়বদ্ধ। আর তারা এতে যথাযথ সীমা অতিক্রম করেছে যদিও তারা তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেনি। এই ব্যক্তিগুলোর প্রতিদান এই যে, এর ফলে তাদের ন্যায্যগুলো উপেক্ষিত হবে আর কিছু ক্ষেত্রে তাদের সাথে ন্যায্য আচরন করা হবে না, আর না তাদের সাহায্য করা হবে যে তাদেরকে দমিয়ে রেখেছে তার বিরুদ্ধে; যেমনিভাবে তারা যে ব্যক্তিকে হিংসা করা হয় তাকে সাহায্য করেনি, যে ছিল নিপীড়িত।

আর প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যক্তি কথা বা কাজের দ্বারা যে ব্যক্তিকে হিংসা করা হয় তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করলে সে এর জন্য শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ও সবর অবলম্বন করবে এবং যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, তার তাকওয়ার জন্য আল্লাহ তার কল্যাণ করবেন।

২.৮ হিংসার কারন

এটি যাইনাব বিনতে জাহশ (রাঃ) এর সাথে ঘটেছিল। তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে আয়েশা (রাঃ) এর সাথে প্রতিযোগিতা করতেন।

কিছু মহিলার অন্যদের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করাটা মহান, বিশেষ করে এটি তাদের জন্য সত্য যারা একজন স্বামীকে বিয়ে করেছে। একজন মহিলা তার স্বামী থেকে বরাদ্দকৃত সময় আরো বেশী পরিমাণে পেতে চায়, কারন কোন কোন সময় অন্যান্য স্ত্রীদের সময় দেওয়ার কারনে তার প্রতি বরাদ্দকৃত সময় সে মিস করে।

এই হিংসা সাধারণভাবে ঘটে থাকে কতৃত্ব বা ধনসম্পদের [৩৮] অংশীদারদের মধ্যে, যখন তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি তা থেকে একটি অংশ গ্রহণ করে আর অন্যরা কিছু ছাড়াই বিদায় হয়। এটি তর্ককারীদের মধ্যেও ঘটে থাকে, কারন তারা ঘৃণা করে যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের তুলনায় আরো ভালোভাবে তর্ক করবে; যেমনটি হল ইউসুফ (আঃ) এর ভাইদের হিংসা, অথবা আদম (আঃ) এর দুই সন্তানের মধ্যে একজনের অপরের প্রতি হিংসা - এক্ষেত্রে এক ভাই অপর ভাই দ্বারা হিংসার কবলে পড়েছিল আল্লাহ কতৃক তার ত্যাগ গ্রহণ হওয়ার কারনে, অপর ভাইয়ের ত্যাগ গ্রহণ করা হয়নি, এর ফলে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আর একটি উদাহারন হল ইয়াহুদি কতৃক মুসলিমদের প্রতি হিংসা প্রদর্শন।

বলা হয়ে থাকে, "সর্বপ্রথম যে পাপগুলো দিয়ে আল্লাহ্‌কে অমান্য করা হয় সেগুলো তিনটি - লোভ, অহংকার আর হিংসা। আদম (আঃ) লোভ করেছিলেন, ইবলিস অহংকার করেছিল আর কাবিল হিংসাবশত হাবিলকে হত্যা করেছিলো।" [৩৯]

এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "এমন তিনটি পাপ আছে যা থেকে কেউই রক্ষা পায় না - হিংসা, সন্দেহ আর পূর্বলক্ষণ। আমি কি তোমাদের বলবো যে কি তোমাদেরকে এগুলো থেকে সরিয়ে দিবে - যখন তোমার হিংসা হবে তখন ঘৃণা করবে না, যখন তোমার সন্দেহ হবে তখন সন্দেহকে বাস্তবে পরিণত করবে না, আর যখন তুমি পূর্বলক্ষণ দেখবে তখন সেগুলো উপেক্ষা করবে।" [৪০]

সুনানে বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিদের ব্যাধি - হিংসা ও ঘৃণা দ্বারা পীড়িত। এগুলো হল কর্তনকারী; আমি এটি বুঝাচ্ছি না যে সেগুলো চুল কর্তনকারী, বরং সেগুলো দ্বীন কর্তনকারী।" [৪১]

সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংসাকে একটি ব্যাধি বলেছেন, যেমনটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন যে কৃপণতা একটি ব্যাধি -

"আর কোন ব্যাধিটি কৃপণতা থেকে অধিকতর মন্দ ?" [৪২]

আরেকটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, "আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই মন্দ চরিত্র ও আচার- ব্যবহার, নিরর্থক কামনা এবং অসুস্থতা থেকে।"

এখানে অসুস্থতাকে আচার ব্যবহার ও নিরর্থক কামনার পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। আচার- ব্যবহার হল সেগুলো, যেগুলোতে আত্মা এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে সেগুলো আত্মার স্বভাব ও প্রকৃতি হয়ে যায়। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (٤)

"এবং নিঃসন্দেহে তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।" (সূরা কালাম, ৬৮ : ৪)

এই আয়াতের তাফসীরে ইবন আব্বাস, ইবন উনাইনাহ এবং আহমাদ ইবনে হানবাল বলেন, "এর অর্থ হল 'একটি মহান দ্বীনের উপর' "। ইবন আব্বাসের ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, "দ্বীন ইসলামের উপর।"

এটি একইভাবে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, "কুরআনই ছিল তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) চরিত্র।"

আর হাসান আল- বাসরি বলেন, "কুরআনের আচার- ব্যবহারই হল 'চরিত্রের মর্যাদাপূর্ণ মানদণ্ড' "।

'নিরর্থক কামনা- বাসনা' হল সাময়িক অস্বাভাবিক অবস্থা, এবং 'ব্যাধি' হল অসুস্থতা - এটি এমন এক দুর্দশা যা অন্তরের ক্ষতি করে আর একে বিকৃত করে।

প্রথম হাদিসটিতে হিংসাকে ঘৃণার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কারন হিংসুক ব্যক্তি প্রথমে হিংসার শিকার হওয়া ব্যক্তির উপর আল্লাহ কতৃক প্রদত্ত অনুগ্রহকে অপছন্দ করে, এরপর সে সেই ব্যক্তিকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এটা এ কারনে যে, প্রদত্ত অনুগ্রহের প্রতি ঘৃণা করাটা অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি ঘৃণা করার দিকে পরিচালিত করে। কারন ব্যক্তি যখন আল্লাহ'র অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়, হিংসুক পছন্দ করে যে সেই অনুগ্রহগুলো যেন চলে যায়; আর যে ব্যক্তিকে হিংসা করা হয় তার দ্বারা চলে যাওয়া ছাড়া সেগুলো চলে যাবে না। সুতরাং হিংসুক ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করে আর এটি ভালবাসে যে ওই ব্যক্তি অনুগ্রহপ্রাপ্তদের মধ্যে থাকবে না।

হিংসা অবধারিতভাবে কামনা- বাসনা আর ঘৃণার দিকে পরিচালিত করে, যেমনটি আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন আমাদের পূর্ববর্তীদের সম্পর্কে যে তারা পৃথক হয়ে গিয়েছিলো,

إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّـهِ ٱلْإِسْلَـٰمُ ۗ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّـهِ فَإِنَّ ٱللَّـهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١٩)

"যাদেরকে আল্লাহ'র পক্ষ থেকে কিতাব দেওয়া হয়েছিলো, তাদের কাছে (আল্লাহ'র পক্ষ থেকে) সঠিক জ্ঞান আসার পর তারা (এ জীবনবিধান থেকে বিচ্যুত হয়ে) নিজেরা একে অপরের প্রতি হিংসা বশত (বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে) মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো।" (সূরা আল ইমরান, ৩ : ১৯)

সুতরাং জ্ঞানের অভাবের কারনে এই পৃথক হয়ে যাওয়া ঘটেনি, বরং তারা সত্য জানত; এটি ঘটার কারন হল তাদের মধ্যে কিছু লোক অপরদের ঘৃণা করতো, যেমনটি হিংসুক ব্যক্তি তাকে ঘৃণা করে যাকে হিংসা করা হয়।

আল- বুখারি ও মুসলিমের সাহিহতে আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা একে অপরকে হিংসা করো না, একে অপরকে ঘৃণা করো না, একে অপরের বিরোধিতা করো না আর সম্পর্ক ছিন্ন করো না; বরং (একে অপরের) ভাই হিসেবে আল্লাহ'র গোলাম হও। একজন মুসলিমের জন্য এটি অনুমোদিত না যে সে তার ভাইয়ের তিন দিনের বেশী সময় ধরে বিচ্ছিন্ন থাকবে এভাবে যে তারা (একে অপরের সাথে) সাক্ষাৎ করবে না আর একজন অপরজনকে উপেক্ষা করবে; এবং তাদের মধ্যে সর্বোত্তম হল যে শুরুতেই সালাম দেয়।" [৪৩]

আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক নির্ভরযোগ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে সত্তার হাতে আমার আত্মা রয়েছে তার শপথ, তোমাদের মধ্যে কেউই ঈমান আনলো না যতক্ষণ না পর্যন্ত সে নিজের জন্য যা ভালবাসে তার ভাইয়ের জন্যও তা ভালবাসে।" [৪৪]

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّـهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّـهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣)

"তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন (মুনাফিক) লোক থাকবে, যে (যুদ্ধের ব্যাপারে) গড়িমসি করবে, তোমাদের উপর কোন বিপদ- মুসিবত এলে সে বলবেঃ আল্লাহ সত্যিই আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন, (কেননা) আমি সে সময় তাদের সাথে ছিলাম না। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহ'র পক্ষ থেকে (বিজয়ের) অনুগ্রহ আসে, তখন সে (এমনভাবে) বলে, যেন তার সাথে তোমাদের কোন রকম বন্ধুত্বই ছিল না, সে (তখন আরো) বলেঃ কতই না ভালো হতো যদি আমি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে (আজ) আমিও অনেক বড় সফলতা অর্জন করতে পারতাম।" (সূরা নিসা, ৪ : ৭২- ৭৩)

সুতরাং পিছনে পড়ে থেকে গড়িমসি করা এসব লোকগুলো নিজেদের জন্য যেটি পছন্দ করে, তাদের অপর মুসলিম ভাইদের জন্য তা পছন্দ করেনি। বরং যদি মুসলিমেরা কোন বিপদে পড়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়, তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায় এজন্য যে কেবল সেই মুসলিমরাই দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছে; আর যদি মুসলিমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়, তবে তারা আনন্দিত হয় না বরং তারা আশা করে যে তাদেরও সেই অনুগ্রহের এক অংশ যদি থাকতো!

সুতরাং এই দুনিয়া থেকে কিছু পাওয়া ছাড়া বা এই দুনিয়ার কোন অমঙ্গল তাদের থেকে সরে যাওয়া ছাড়া তারা আনন্দিত হয় না। এটি ছিল আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এবং আখিরাতের আবাসকে না ভালোবাসার কারনে। কারন, যদি তারা এগুলোর প্রতি অন্তরে ভালোবাসা রাখতো, তবে তারা তাদের ভাইদের ভালোবাসতো আর তাদের ভাইদের আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত হওয়াকে ভালোবাসতো আর তাদের মুসলিম ভাইদের বিপদ - যা তাদের দুর্দশা করেছে, তা দ্বারা তারা আহত হতো।

যে ব্যক্তি মুসলিমদের আনন্দিত করার বিষয়ে আনন্দিত হয় না এবং মুসলিমদের কষ্ট দেয় এমন বিষয়ে কষ্টবোধ করে না, সে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়।

আল-বুখারি ও মুসলিমের সাহিহতে আমির আশ-শা'বি থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলেনঃ আমি নু'মান বিন বাশিরকে খুৎবা দিতে শুনলাম, তিনি বলেছিলেন যে তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, "পরস্পর বন্ধুত্ব, দয়া, একে অপরের প্রতি আকর্ষণ ও ঐক্যের ক্ষেত্রে মুমিনের উদাহারন হল একটি শরীর। যখন শরীরের কোন একটি অংশ পীড়িত হয়ে পড়ে তখন শরীরের অবশিষ্ট অংশের ঘুম আসে না। অস্বস্তিবোধ হয় আর জ্বর এসে যায়।" [৪৫]

আল-বুখারি ও মুসলিমের সাহিহতে আবু মুসা আল-আশ'আরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "মুমিন মুমিনের জন্য ইমারতের ন্যায়, যার এক অংশ অন্য অংশকে মজবুত করে রাখে।" এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) হাতের আঙ্গুলগুলো আরেক হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকালেন। [৪৬]

২.৯ হিংসা ও কৃপণতার মাঝে

কৃপণতার মতো একটি অসুস্থতা হল লোভ- লালসা, আর হিংসা হল কৃপণতার থেকেও অধিক মন্দ, যেমনটি আবু দাউদে [৪৭] বর্ণিত হাদিসে বলা হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "হিংসা সৎ কর্মসমূহকে ক্ষয় করে যেমনটি আগুন জ্বালানী কাঠকে ক্ষয় করে, আর সাদকা করা পাপসমূহকে নিভিয়ে দেয় যেমনটি পানি নিভিয়ে দেয় আগুনকে।"

কারন কৃপণ ব্যক্তি তো কেবল কল্যাণ পাওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে, কিন্তু হিংসুক ব্যক্তি তো আল্লাহ'র অনুগ্রহ তার গোলামকে প্রদান করাটা অপছন্দ করে। এটি সম্ভব যে একজন ব্যক্তি তার থেকে কম সম্পদ থাকা একজনকে সম্পদ দান করে, যে তাকে সাহায্য করবে তার উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য আর তা সত্ত্বেও তার মত অনুরূপ স্তরের ব্যক্তিদের প্রতি হিংসা প্রদর্শন করবে, যেমনভাবে তার জন্য এটি সম্ভব যে সে কৃপণতা করবে অন্যদের প্রতি হিংসা না দেখিয়েই। লোভই হল এর ভিত্তি যেমনটা আল্লাহ বলেছেন -

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٩)

"যারা কার্পণ্য থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে তারাই সফলকাম।" (সূরা হাশর, ৫৯ : ৯)

সাহিহ বুখারি ও সাহিহ মুসলিমে [৪৮] বর্ণিত আছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "তোমরা লোভ করা থেকে সতর্ক হও, কারন এটি তোমাদের পূর্ববর্তীদের ধ্বংস করে দিয়েছে। এটি তাদেরকে আদেশ করেছিল কৃপণ হওয়ার আর তারা তা হয়েছিলো, এটি তাদেরকে আদেশ করেছিলো যালিম হওয়ার জন্য আর তারা তা হয়েছিলো আর এটি তাদেরকে আদেশ করেছিলো আত্মীয়তার বন্ধন ভেঙে দেওয়ার আর তারা তা করেছিলো।"

'আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) [৪৯] তাওয়াফ করার সময় তার দুয়ায় বারবার বলতেন - "হে আল্লাহ, আমার আত্মাকে লোভ লালসা থেকে রক্ষা করুন।" এক ব্যক্তি তাকে বললো, "আপনার এই দুয়াটি বারবার পড়ার কারন কি ?" তিনি বললেন, "যখন আমি নিজেকে লোভ লালসা থেকে রক্ষা করি, তখন আমি নিজেকে রক্ষা করি লোভ, কার্পণ্য আর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা থেকে।"

আর হিংসা তো অবধারিতভাবেই জুলুমের দিকে পরিচালিত করে।

তৃতীয় অধ্যায়

কামনা- বাসনা ও প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসাজনিত ব্যাধি

৩.১ হিংসা ও কামনা- বাসনার মাঝে

কৃপণতা আর হিংসা হল এমন অসুস্থতা, যা আত্মাকে এর জন্য কল্যাণকর কিছুকে ঘৃণা করার দিকে আর এর জন্য ক্ষতিকর কিছুকে ভালোবাসার দিকে পরিচালিত করে। এ কারনেই পুর্ববর্তী হাদিসে হিংসাকে ঘৃণা ও অসন্তোষের পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। কামনা- বাসনা ও প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসাজনিত অসুস্থতার ব্যাপারে আত্মা তার ক্ষতিকারক কিছুকে ভালবাসে আর এটির সাথে তার যুক্ত থাকাটা হল তার জন্য কল্যাণকর কিছুকে ঘৃণা করা।

প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা একটি মানসিক অসুস্থতা। যখন এর প্রভাব শরীরে লক্ষ্য করা যায়, এটি এমন অসুস্থতায় পরিণত হয় যা মনকেও দুর্দশাগ্রস্ত করে - হয় বিষণ্ণতার অনুরূপ কিছু দ্বারা মনকে দুর্দশাগ্রস্ত করার মাধ্যমে, অথবা দুর্বলতা ও ক্ষীণতার মাধ্যমে শরীরকে দুর্দশাগ্রস্ত করার মাধ্যমে। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হল অন্তরের উপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা। কারন প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসাই হল সেই ভিত্তি, যা আত্মাকে তার ক্ষতিকারক কিছুর প্রতি লোভাতুর করে। অনুরূপ হল শারীরিকভাবে দুর্বল সেই ব্যক্তি, যে তার শরীরের জন্য ক্ষতিকারক কোন কিছুর প্রতি লোভ করে। সে যদি সেটি দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত না হয় তবে সে দুঃখে পতিত হয় আর সম্পূর্ণভাবে পরিতৃপ্ত হলে তার অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়।

৩.২ প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসার (ইশক) বাস্তবতা

এই ভালোবাসা দিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া অন্তরের ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রযোজ্য। কারন এটি এর ভালোবাসার বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্ক দ্বারা - হয় দেখা, স্পর্শ করা, শ্রবণ করা, এমনকি সেটি সম্পর্কে চিন্তা করা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যদি সে ভালবাসাকে দমন করে, তবে তার অন্তর এর দ্বারা আহত হবে ও কষ্ট পাবে। আর যদি সে কামনা- বাসনার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, তবে অসুস্থতা আরও প্রবল হবে আর তা এমন এক নিমিত্তে পরিণত হবে যেটির মাধ্যমে দুর্দশা বৃদ্ধি পাবে।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বিশ্বাসী গোলামদেরকে দুনিয়া থেকে এমনভাবে আশ্রয় দেন, যেমনটা তোমাদের মধ্যে কেউ তোমাদের অসুস্থ ব্যক্তিকে (তার জন্য ক্ষতিকারক) খাবার ও পানীয় থেকে আশ্রয় দিয়ে থাকো।” [৫০]

আয- যুহদ কিতাবে ইমাম আহমাদ কতৃক লিপিবদ্ধ মুসা (আঃ) কে রক্ষা করা সম্পর্কে ওয়াহব [৫১] বর্ণিত এক হাদিসে আছে যে আল্লাহ বলেন, “নিশ্চয়ই আমি আমার বন্ধুদেরকে এই দুনিয়ার আনন্দ- উল্লাস, এর প্রাচুর্য ও আরাম- আয়েশ থেকে তাড়িয়ে দেই, যেমনটি দয়ালু পশুপালক তার উটকে তাড়িয়ে দেয় বিপজ্জনক চারণ ভূমি থেকে। আর নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে এর প্রশান্তি ও জীবিকা থেকে এড়িয়ে রাখি, যেমনটি দয়ালু পশুপালক তার উটকে সহজেই শিকার করা যায় এমন বিশ্রামের স্থান থেকে এড়িয়ে রাখে। এটি এ কারনে নয় যে আমি তাদেরকে তুচ্ছ মনে করি, তবে (এটির জন্য যে) যাতে করে তারা নিরাপত্তা ও প্রাচুর্যে আমার দয়ার অংশ সম্পূর্ণ করতে পারে, দুনিয়ার আনন্দ- উল্লাস তাকে আকর্ষণ করবে না আর কামনা- বাসনা তাকে পরাস্ত করবে না।”

সুতরাং, অসুস্থতার একমাত্র চিকিৎসা নির্ভর করে তার অন্তর থেকে এই নিন্দনীয় ভালোবাসা দূরীভূত করার মাধ্যমে তার অসুস্থতা দূর করার উপর।

প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসা বিষয়ে লোকেরা দুটি মতামতে বিভক্ত - প্রথম দল বলে যে এটি নিয়্যত ও ইচ্ছার শ্রেণীতে পড়ে, এটি হল বিখ্যাত মতামত।

অপর দল বলে, এটি কল্পনা ও খোশখেয়ালের শ্রেণীর মধ্যে পড়ে আর এটি কল্পনাশক্তির একটি বিকৃতি, যেহেতু এর কারনে ব্যক্তি তার ভালোবাসার ব্যক্তিকে তার সত্যিকারের বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনায় ছবির মতো তুলে ধরে। এই দলটি এরপর বলে, “এবং এ কারনেই আল্লাহ্‌কে প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা (ইশক) সহকারে বর্ণনা করা হয় নি আর না তিনি প্রবল আবেগতাড়িতভাবে (ইয়া’শিক) ভালোবাসেন, কারন তিনি এ থেকে বহুদূরে। আর যার এই বিকৃত চিন্তাগুলো রয়েছে সে প্রশংসিত হতে পারে না।”

প্রথম দলের লোকেরা বলে, “তিনি প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা (ইশক) সহকারে বর্ণিত হয়েছেন, কারন এটি হল একটি সম্পূর্ণ ও যথাযথ ভালোবাসা এবং আল্লাহ ভালোবাসেন (য়ুহিব)।”

আর আব্দুল ওয়াহিদ বিন যাইদ এর বর্ণনায় রয়েছে যে তিনি বলেন, “আমাকে ভালবাসতে থেকে গোলাম সমসময় আমার নিকটবর্তী হতে থাকবে আর আমি তাকে ভালবাসতে থাকব (আ’শিকুহু)।”

এটি হল কিছু সুফির কথা, তবে অধিকাংশই এই শব্দ আল্লাহর প্রতি সংশ্লিষ্ট করেন না। কারণ প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসা (ইশক) হল যথাযথ সীমাকে ছাড়িয়ে যাওয়া এক ভালবাসা, আর আল্লাহকে ভালবাসার কোন শেষ নেই এবং

তা যথাযথ সীমাও ছাড়িয়ে যেতে পারে না। কোন ব্যাতিক্রম ছাড়াই প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসাকে নিন্দনীয় বিবেচিত করতে হবে। সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্ট – যার প্রতিই এটি নির্দেশ করুক না কেন, এটি প্রশংসিত হবে না কারণ এটি এমন এক ভালোবাসা যা যথাযথ সীমা অতিক্রম করে।

এটিও সত্য, কারন “প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসা” (“ইশক”) শব্দটি কেবলমাত্র সে ব্যক্তির প্রতিই প্রয়োগ করা হয়, যে একজন নারী বা শিশুকে ভালবাসে (অথবা বিপরীতভাবে), এটিকে ব্যক্তির পরিবার, সম্পত্তি বা তার অবস্থার প্রতি প্রয়োগ করা হয় না, যেমনটি এটি প্রয়োগ করা হয় না নবী- রাসুলগণ বা ধার্মিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভালবাসার প্রতি। সাধারনত আপনি নিষিদ্ধ কাজের পাশাপাশি এই শব্দ পাবেন, যেমন – এমন নারীকে ভালোবাসা যে নারী তার জন্য বৈধ নয়, অবৈধ দৃষ্টি ও স্পর্শ আর অনুরূপ অন্যান্য অবৈধ কাজ সহকারে একজন শিশুকে ভালোবাসা।

একজন পুরুষের তার স্ত্রী বা ক্রীতদাসীর জন্য ভালোবাসা তাকে ন্যায়পরায়নতার গন্ডির বাইরে এমনভাবে পরিচালিত করে যে, সে সেই নারীর জন্য হারাম কাজ করে আর ফরয কাজ বর্জন করে, যা সাধারণভাবে ঘটে থাকে – এমনকি সেটি এই পর্যন্ত গড়ায় যে সে তার নতুন স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কারণে তার পুরনো স্ত্রী থেকে জন্মলাভ করা পুত্রের উপর জুলুম করে, অথবা সেটি এ পর্যন্ত গড়ায় যে সেই নারীকে সুখী রাখার জন্য সে এমন কাজ করবে যা তার দ্বীন ও পার্থিব জগতের জীবনের ক্ষতি করবে। উদাহারনস্বরূপ, সেই নারীকে এমন উত্তরাধিকারের জন্য বেছে নেওয়া সে যেটির প্রাপ্য নয়, অথবা তাকে পরিবারের কতৃত্ব ও সম্পত্তি প্রদান করা, যা আল্লাহ’র স্থির করে দেওয়া সীমা অতিক্রম করে; অথবা সেই নারীর জন্য বাড়াবাড়ি খরচ করা; অথবা সেই ব্যক্তি কতৃক সেই নারীর জন্য হারাম বিষয়গুলোকে সেই নারীর সাধ্যে নিয়ে আসা যা সেই ব্যক্তির দ্বীন ও পার্থিব জগতের জীবনের ক্ষতিসাধন করবে।

তার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তি সম্পর্কেই এই প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা হারাম, সুতরাং তার ক্ষেত্রে এটি কেমন হবে, যার কিনা হারাম ব্যক্তির জন্য বা দুই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা আছে ? কারন এতে এমন এক বিকৃতি রয়েছে যেটির সীমা গোলামদের রব ছাড়া আর কেউই পরিমাপ করতে পারবে না। এটি একটি অসুস্থতা যা দ্বীন ও এর অধিকারী ব্যক্তির উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে, এরপর এটি তার বুদ্ধিমত্তাকে বিকৃত করে আর পরবর্তীতে বিকৃত করে তার শরীরকে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (٣٢)

“... যদি তোমরা (সত্যিই) আল্লাহ্‌কে ভয় করো, তাহলে (অন্য পুরুষদের সাথে) কথা বলার সময় কোমলতা অবলম্বন করো না, (যদি এমন করো) তাহলে যার অন্তরে কোন ব্যাধি আছে সে তোমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ হয়ে পড়বে, (তবে) তোমরা (সবসময়ই) নিয়মমাফিক কথা বলবে।” (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩২)

এমন কিছু মানুষ রয়েছে যাদের অন্তরে কামনা- বাসনার ব্যাধি রয়েছে আর যাদের উপলব্ধি কেবলই অগভীর। যখন কামনা- বাসনার বিষয়বস্তুতে আত্মসমর্পণ করা হয়, তখন অসুস্থতা পরিতৃপ্ত হয়; আর এই পরিতৃপ্তি কামনা- বাসনাকে শক্তিশালী করে ও সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের অনুসরণ করে, এরপর অসুস্থতা শক্তিশালী হয়।

এটি হল সেই ব্যক্তির বিপরীত, যার কাঙ্ক্ষিত বিষয় মিলেনি। এই ব্যর্থতার ফলে তার অসুস্থতা শক্তিশালীকারী চরিতার্থ দূর হয়ে যায়, যার ফলে ভালোবাসার মতো কামনা- বাসনাও কমজোর হয়ে পড়ে। কারন ব্যক্তি স্পষ্টভাবে মনস্থ করে যে

তার কামনা- বাসনার সাথে সাথে সেই কাজটি সম্পাদন হওয়ার ব্যাপারটিও থাকবে; কারন অন্যথায় তার সকল কামনা- বাসনা হবে কেবলই আত্মার ফিসফিসানি, যদি না কিছু কথা বা দৃষ্টি এর সাথে থাকে।

এই প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসা দ্বারা যে নিপীড়িত ব্যাক্তি তা করা থেকে নিজেকে আটকিয়ে রাখে আর সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে তার তাকওয়ার জন্য পুরস্কৃত করবেন; যেমনটি বর্ণিত হয়েছে হাদিসে - "যে ব্যাক্তি কাউকে প্রবল আবেগতাড়িত হয়ে ভালোবাসা সত্ত্বেও নিজেকে তা থেকে আটকিয়ে রাখে, সেটি গোপন করে আর সবর অবলম্বন করে এবং এরপর এর উপরই (আমল করা অবস্থায়) মারা যায়, তবে সে একজন শহীদ হবে। [৫২]

এই হাদিসটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মুজাহিদ থেকে ইয়াহয়া আল- কাতাতের বর্ণনা হিসেবে পরিচিত, কিন্তু এই হাদিসটি সন্দেহযুক্ত আর এ ধরণের হাদিসের উপর নির্ভর করা যায় না।

কিন্তু শারিয়াহ'র দলীলগুলো থেকে জানা যায় যে, যদি কেউ হারাম কাজ করা থেকে নিজেকে আটকিয়ে রাখে – এটি হোক দেখা, বলা বা কর্ম সম্পাদন করা, আর সে এটি গোপন করে ও এটি স্পষ্টভাবে বলে না যাতে সে হারামে পতিত না হয় এবং আল্লাহ'র প্রতি আনুগত্যে সবর অবলম্বন করে আর প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসার কারনে তার অন্তরে অনুভূত বেদনা সত্ত্বেও আল্লাহ'র অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকে (অনুরূপ ঘটনা তার ক্ষেত্রেও, যে দুর্দশা চলাকালীন সময়ে সবর অবলম্বন করে), তবে নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি মুত্তাকী ও সবর অবলম্বনকারী ব্যক্তিদের মতো পুরস্কৃত হবে।

إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّـهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠)

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে আর সবর করে, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের পুরস্কার বিনষ্ট করেন না।" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ৯০)

এটি অন্তরকে পীড়িতকারী ব্যাধি হিংসা ও অন্যান্য সকল অসুস্থতার জন্য সত্য। সুতরাং, আল্লাহ রাগান্বিত হোন এমন কিছুকে যখন আত্মা অনুসরণ করে আর ব্যাক্তি আল্লাহকে ভয় করে তা থেকে নিজেকে বিরত রাখে, তবে সে আল্লাহ যা বলেছেন তার অন্তর্ভুক্ত -

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (٤١)

"পক্ষান্তরে যে তার রবের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে আর তার আত্মাকে নিরর্থক কামনা বাসনা থেকে বিরত রেখেছে, তবে নিশ্চয়ই জান্নাতই হবে তার ঠিকানা। (সুরা নাজিয়াত, ৭৯ : ৪০-৪১)

আত্মা যখন কোন কিছু ভালবাসে, তখন সে তা অর্জনের জন্য সব কিছুই করে। সুতরাং যে ব্যক্তি নিন্দনীয় ভালোবাসা বা ঘৃণাবশত এটি করে, তার এই কাজটি পাপপূর্ণ হবে। এর একটি উদাহারন হল, কোন ব্যক্তিকে হিংসা করার কারনে তাকে ঘৃণা করা, আর এর ফলে সেই ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত ব্যক্তির ক্ষতি করা – হয় তার অধিকার ব্যাহত করার মাধ্যমে

বা তাদেরকে শক্রুতা প্রদর্শনের মাধ্যমে বা আল্লাহ’র কোন আদেশ আল্লাহ’র কারনে নয় বরং নিজের কামনা- বাসনার কারনে সম্পাদন করা।

এই ধরণের অসুস্থতা সাধারণভাবে অন্তরে পাওয়া যায়। ব্যক্তি কোন কিছুকে ঘৃণা করতে পারে আর এই ঘৃণার কারনে সে নিছকই খামখেয়ালীর কারনে অনেক কিছুই ভালবাসে। যেমনটি এটি দ্বারা প্রভাবিত এক কবি বলেন,

একটি সুদানি মেয়ের জন্য সে সুদানকে ভালবাসলো

এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে

সে ভালবাসলো কালো কুকুরকে

ওর প্রতি তার ভালোবাসার কারনে।

সুতরাং সে একজন কাল মেয়েকে ভালবাসলো, আর এ কারনে সে সব ধরণের কালোকে ভালবাসলো, এমনকি কুকুরদের কালিমাকেও! এর সবই হল এর মায়া, কল্পনা ও কামনা- বাসনা সম্পর্কিত অন্তরের একটি অসুস্থতা। আমরা আল্লাহ’র নিকট দুয়া করি যেন তিনি আমাদের অন্তর থেকে এসব ব্যাধি দূর করে দেন; আর আমরা মন্দ কার্যপদ্ধতি, কামনা- বাসনা ও অসুস্থতা থেকে আল্লাহ’র নিকট আশ্রয় চাই।

৩.৩ আল্লাহ্‌কে ভালবাসাই হল অন্তরের সহজাত প্রবৃত্তি

অন্তরকে কেবল আল্লাহ'র ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এটিই হল সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাত), যেটির উপরে আল্লাহ তার গোলামদের সৃষ্টি করেছেন, যেমনটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন –

"প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের উপর ভুমিস্ট হয়ে থাকে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, খ্রিস্টান ও মাজুসি করে গড়ে তোলে। যেমনটি বকরীর নিখুঁত বাচ্চা পয়দা হয়, এরপর বকরীর মালিক তার কান কেটে দেয়।"

এরপর আবু হুরাইরা (রাঃ) বললেন, যদি চাও আল্লাহ'র এই আয়াত তিলাওয়াত করো -

فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

"যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন; আল্লাহ'র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই।" (সুরা রুম, ৩০ : ৩০) [৫৩]

সুতরাং আল্লাহ তার গোলামের সহজাত স্বভাব করে দিয়েছেন তাকে ভালোবাসার জন্য আর একমাত্র তারই ইবাদাত করার জন্য। সুতরাং, যদি সহজাত স্বভাবের বিকৃতি সাধন ছাড়াই এটি কারো থেকে চলে যায় তবে এ ব্যাপারে আল্লাহ'ই ভালো জানেন, একমাত্র তাকেই ভালবাসতে হবে। কিন্তু অন্তরের অসুস্থতার কারনে সহজাত প্রবৃত্তি বিকৃত হয়ে থাকে, যেমন - পিতামাতা কতৃক একে ইয়াহুদি বা খ্রিস্টান বানানো; এমনকি যদিও এটি আল্লাহ'র ইচ্ছা ও পূর্বনির্ধারণের কারনে হয়, যেমনটি শরীরের পরিবর্তন ঘটে অঙ্গচ্ছেদের দ্বারা। কিন্তু এর পরেও এটি সম্ভব যে অন্তর এর সহজাত স্বভাবে ফিরে আসবে যদি আল্লাহ সে ব্যক্তির জন্য সহজ করে দেন - যে ব্যক্তি সহজাত স্বভাবে ফিরে যাওয়ার জন্য তার সর্বাধিক প্রচেষ্টা করবে।

রসূলদের প্রেরণ করা হয়েছিলো সহজাত স্বভাবের সত্যতা সমর্থন ও এর পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আর এটিকে যথাযথ করার জন্য, এর পরিবর্তনের জন্য নয়। সুতরাং অন্তর যখন কেবলই আল্লাহ্‌কে ভালবাসে, একনিষ্ঠভাবে তার জন্যই দ্বীন পালন করে, তখন এটি অন্য কাউকে ভালবাসবে না।

এখানে প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা সহকারে চেষ্টা করার উল্লেখ করা হয়নি, কারন এটি যদি প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা দিয়ে নিপীড়িত হতো তবে এটি কেবলই আল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসা কমিয়ে দিতো। এ কারনেই ইউসুফ (আঃ) কে যখন তার প্রতি এই প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা (ইশক) দ্বারা চেষ্টা করা হয়েছিলো, তখন তার কেবল আল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসা আর একমাত্র আল্লাহ'র জন্যই একনিষ্ঠভাবে দ্বীন পালন করা তাকে এর দ্বারা পরাস্ত হতে সম্মতি দেয়নি, বরং আল্লাহ বলেন,

لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ ۚ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤)

"এভাবেই (আমি ইউসুফকে নৈতিকতার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম) যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাজ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি, অবশ্যই সে ছিল আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন।" (সুরা ইউসুফ, ১২ : ২৪)

আল-আযীযের স্ত্রী আর তার জাতি ছিল মুশরিক, তাই সে প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসা দিয়ে নিপীড়িত হয়েছিল। কেবলমাত্র আল্লাহ'র ইবাদাত ও ঈমানের হ্রাস করা ছাড়া কেউই প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা (ইশক) দিয়ে নিপীড়িত হয় না।

যে অন্তর আল্লাহ'র কাছে তওবা করে আর তাকে ভয় করে, তার দুটো পথ আছে, যা দ্বারা সে তার এই প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা দূর করতে পারে।

৩.৪ প্রবল আবেগতাড়িত ভালোবাসা প্রতিরোধের উপায়

১) আল্লাহ'র কাছে তাওবা করা আর তাকে ভালবাসা, কারন নিশ্চয়ই এটিই হল যেকোন কিছু থেকে অধিকতর সন্তোষজনক ও পবিত্র; আর আল্লাহ'র পাশাপাশি ভালোবাসার মতো আর কিছুই থাকবে না।

২) আল্লাহকে ভয় করা, কারন নিশ্চয়ই ভয় হল প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসার বিপরীত আর এটিকে দূর করে।

সুতরাং, যারা কাউকে গভীর আসক্তি সহকারে বা অন্যভাবে কোন কিছুকে ভালবাসে, তাদের এই ভালোবাসা দূর করা যাবে এর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী অধিকতর প্রিয় কিছুকে ভালোবাসা দ্বারা। [৫৪]

এই ভালোবাসা দূর করার আরও একটি উপায় হল এমন ক্ষতিসাধনের ব্যাপারে ভয় করা, যেটি ব্যক্তির নিকট এই ভালোবাসা বর্জন করার থেকেও অধিকতর ঘৃণ্য। সুতরাং যখন গোলামের কাছে যে কোন কিছু থেকে আল্লাহই অধিকতর প্রিয় হবেন আর সে যেকোন কিছু থেকে আল্লাহকেই অধিকতর ভয় করবে, তখন সে প্রবল আবেগতাড়িত ভালবাসায় পড়বে না বা আল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন ভালোবাসা পাবে না - এটি ব্যতীত যে অবহেলা করা বা কিছু ফরয দায়িত্ব ও কিছু হারাম কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে এই ভালোবাসা ও ভয় দুর্বল হয়ে যাবে। কারন, নিশ্চয়ই ঈমান বৃদ্ধি পায় আল্লাহ'র আনুগত্য করার মাধ্যমে আর কমে যায় আল্লাহ'র অবাধ্য হওয়ার মাধ্যমে। সুতরাং গোলাম যখন ভালোবাসা ও ভয়বশত আল্লাহ'র আনুগত্য করবে আর তার প্রতি ভালোবাসা ও ভয়বশত একটি হারাম কাজ ত্যাগ করবে, তার ভালোবাসা ও ভয় অধিকতর শক্তিশালী হবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি ভালোবাসা বা ভয় তার অন্তর থেকে চলে যাবে।

৩.৫ অন্তরের জন্য কিছু চিকিৎসা

অনুরূপ বিষয়টি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সত্য, কারন শরীরের স্বাস্থ্য অনুরূপ কিছু দ্বারা সংরক্ষিত থাকে এবং অসুস্থতা বিপরীত দ্বারা অবদমিত হয়। অন্তরে ঈমানের বিশুদ্ধতা এর অনুরূপ দ্বারা সংরক্ষিত হয়; এর অর্থ হল, কল্যাণকর ইলম ও সৎকর্মসমূহ থেকে যা কিছু অন্তরে ঈমানের বৃদ্ধি ঘটাবে। কারন এগুলো হল অন্তরের প্রয়োজনীয় খাবার, যেমনটা ইবনে মাসউদের হাদিস থেকে জানা যায়, যা তার উক্তি হিসেবে আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস হিসেবে বর্ণিত হয়েছে -

"নিশ্চয়ই প্রত্যেক নিমন্ত্রণকর্তাই ভালবাসে যে লোকেরা তার ছড়ানো দস্তরখানায় আসবে, আর নিশ্চয়ই আল্লাহ'র ছড়ানো দস্তরখানা হল কুরআন।"

সুতরাং কুরআন হল আল্লাহ'র ছড়ানো দস্তরখানা।

যে সকল বিষয় অন্তরকে পরিপুষ্ট করে সেগুলো হল রাতের শেষভাগে দুয়া করা, আযান ও ইকামাতের সময় দুয়া করা, সিজদায় দুয়া করা, সালাতের শেষে দুয়া করা [৫৫] - তাওবা করাও। কারন, নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি তাওবা করে আল্লাহ'র কাছে ফিরে যায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে সুখ দান করবেন - সে বর্ণিত আযকার দিনে আর রাতে ঘুমাবার সময় পাঠ করে; এগুলো থেকে তাকে বিমুখ করে দিবে - এমন প্রলুব্ধকর বিষয়গুলো সে সবরের সাথে সহ্য করে, কারন আল্লাহ তাকে তার থেকে একটি স্পিরিট দিয়ে সাহায্য করবেন আর তার অন্তরে ঈমান লিপিবদ্ধ করে দিবেন; সে ফরয কাজগুলো সম্পূর্ণ করতে আগ্রহী হবে, যেমন - অন্তর দিয়ে ও বাহ্যিকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, কারন সেগুলো হল দ্বীনের স্তম্ভ। সাহায্য প্রার্থনার জন্য সে বলবে –

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

লা হাওলা ওয়ালা কুউওওাতা ইল্লা বিল্লাহ [৫৬]

কারন সেগুলো দ্বারা কাজের গুরুভার বহন করা যায়, ভয়ভীতিকে পরাস্ত করা যায় আর বেঁচে থাকার জন্য গোলাম শ্রেষ্ঠ অবস্থা দ্বারা পুরস্কৃত হয়। তাই দুয়া করা আর আল্লাহ'র নিকট সাহায্য চাওয়া ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কারন তাড়াহুড়ো করার আগ পর্যন্ত গোলামকে তার রব তার দুয়ার জবাব দিবেন, যেমনটি হাদিসে উল্লেখ করা আছে যে –

"আমি দুয়া করলাম অথচ আল্লাহ কবুল করেননি।" [৫৭]

তার জেনে রাখা উচিত, সাহায্য আসে সবরের সাথে, মুক্তি আসে বেদনা ও উদ্বেগের পর, প্রত্যেক কাঠিন্যতার পর আসে শান্তি। [৫৮]

সে যেন জেনে রাখে, কোন নবী বা তাদের মর্যাদার নিচে কেউ সবর ছাড়া কল্যাণ দ্বারা পুরস্কৃত হয়নি।

আর সকল প্রশংসা আর শুকরিয়া রব্বুল আ'লামিন আল্লাহ'র জন্যই। আমাদেরকে ইসলাম আর সুন্নাহ'র দিকে পথ দেখানোর জন্য তো সকল প্রশংসা আর অনুগ্রহ তারই, এমন এক প্রশংসা যা বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে আমাদের উপর তার অনুগ্রহের জন্য পর্যাপ্ত, যেমনটি তা তার মর্যাদাপূর্ণ মুখ আর তার বিশালতার প্রতাপের জন্য প্রয়োজন। অজস্র সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের শিক্ষক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর তার (সাল্লাল্লাহু

আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) পরিবার, সাহাবী ও তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) স্ত্রীদের উপর যারা মুমিনদের মা, এবং তাদের উপরও যারা তাদেরকে বিচার দিবসের আগ পর্যন্ত কল্যাণে অনুসরণ করবেন।

পরিশিষ্ট

ইমাম ইবনুল কায়্যিম আল(.রহ) জাওজিয়্যাহ- [৫৯]

তার নাম, জন্ম ও বংশপরিচয়ঃ

তিনি হলেন শামসুদ্দিন আবু ‘আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ুব ইবন সা’দ ইবনে হারিয ইবন মাক্কি যাইনুদ্দিন আয- যুরি আদ- দামিস্কি আল- হানবালি। তার পিতা শাইখ আবু বকর ইবনে আইয়ুব আয- যুরি ছিলেন শামের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হানবালি মাদরাসা, আল- মাদরাসাতুল জাওজিয়্যাহ এর একজন কায়্যিম (পরিচালক)। এ কারনে তিনি ইবনুল কায়্যিম আল- জাওজিয়্যাহ নামেই পরিচিতি লাভ করেন।

তিনি ৬৯১ হিজরির সফর মাসের ৭ তারিখে সিরিয়ার দামাস্কাসের দক্ষিণ- পূর্বে একটি নিকটবর্তী গ্রাম যার- এ এক উচ্চবংশ ও ইলমী পরিবারে জন্মগ্রহন করেন।

ইবনে কাসির বলেন, “তার পিতা ছিলেন একজন সৎকর্মপরায়ণ আবেদ, অকপট ও উন্নতচরিত্রের ব্যক্তি। …… তার জানাযায় অনেক লোক অংশগ্রহণ করেছিলো আর লোকেরা তার খুব প্রশংসা করতো।”

আস- সাফাদি, ইবনে তাগরি বারদি এবং আশ- শাওকানি বলেন যে, ইবনুল কায়্যিমের পিতা ফারযিয়্যাতের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি তার পিতার কাছ থেকেই ফারযিয়্যাত সম্পর্কে ইলম অর্জন করেন।

তার শিক্ষকঃ

তিনি উত্তরাধিকার সম্পর্কিত জ্ঞান গ্রহণ করেছেন ইসমাইল বিন মুহাম্মাদের কাছ থেকে, আরবি ভাষা আবু ফাতহ আল- বালাবকি এবং আল- মাজদ আত- তুনিসি থেকে। একদল আলিমের সংস্পর্শে থেকে তিনি ফিকহ অধ্যয়ন করেন, তাদের মধ্যে একজন হলেন ইসমাইল বিন মুহাম্মাদ আল- হাররানি। তিনি উসুল শিক্ষা গ্রহণ করেন আস- সাফি আল- হিন্দি থেকে। তিনি হাদিস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন শাহাব আল- নাবুলসি, কাযি তাকিউদ্দিন সুলাইমান, ফাতিমা বিনতে জাওহার, ঈসা ইবনে মুত’ইম, আবু বকর ইবনে আব্দুদ্দাইম প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের কাছ থেকে। তবে তার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, যার সাথে সুদীর্ঘ ১৭ বছর থেকে তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন আর যিনি তার জীবনে বড় প্রভাব রেখেছেন, তিনি হলেন মুজাদ্দিদ ও ইমাম, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ’র অর্জিত জ্ঞান আর ইবনুল কায়্যিমের নিজের অর্জিত জ্ঞানের সমন্বয়ে ইবনুল কায়্যিম ইসলামী জ্ঞানের বহুসংখ্যক শাখাতে এক অসাধারণ আলিমে পরিণত হোন।

তার জ্ঞানগত মর্যাদাঃ

ইবনে রজব বলেন, “সকল ইসলামী শাস্ত্রেই তার দখল ছিলো, তবে তাফসীর জগতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। উসুল বিষয়ক শাস্ত্রগুলোতেও তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী ছিলেন। হাদিস, হাদিস বিজ্ঞান এবং ইজতিহাদ ও সূক্ষ্ম যুক্তি প্রয়োগে তার কোন সমকক্ষ চোখে পড়ে না। ফিকহ, ফিকহ বিজ্ঞান, আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং কালাম শাস্ত্রেও তার যথেষ্ট

দখল ছিলো। সূফী দর্শন ও তাসাওউফ তত্ত্বেও তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কুরআন- সুন্নাহ’র ভাব ও মর্ম, ঈমানের হাকিকত ও তত্ত্ব সম্পর্কে তার চেয়ে বড় আলিম কাউকে দেখিনি। অবশ্যই তিনি নিস্পাপ ছিলেন না, তবে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তার মতো মানুষ আমি দেখিনি।”

ইমাম আয- যাহাবি বলেন, “হাদিসের মতন ও সনদের প্রতিও তার অখণ্ড মনোযোগ ছিলো। ফিকহ্ অধ্যয়নেই তিনি সবসময় নিমগ্ন থাকতেন আর শাস্ত্রীয় জটিল বিষয়গুলো বিশদভাবে লিখতেন। ব্যাকরণ শিক্ষাদানে তার বেশ নাম ছিল এবং হাদিস- বিজ্ঞান ও ফিকহ্- বিজ্ঞানেও তার ভালো যোগ্যতা ছিলো।”

আশ- শাওকানি বলেন, “তিনি নিজেকে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলীলে সীমাবদ্ধ করে রাখতেন আর সেগুলোর উপর আমল করার তারীফ করতেন। তিনি মতামত (রাই) এর উপর নির্ভর করতেন না, তিনি অন্যান্যদেরকে সত্য দিয়ে পরাজিত করতেন আর এ ব্যাপারে তিনি কারো সাথেই কর্কশ ছিলেন না।”

ইবনে হাযার বলেন, “তার ছিল এক নির্ভীক অন্তর, ছিল প্রচুর ইলম এবং ভিন্ন মতামত (ইখতিলাফ) ও সালাফদের মাযহাব সম্পর্কেও তিনি ভালোভাবে পরিচিত ছিলেন।”

ইবনে কাসির বলেন, “দিনরাত তিনি নিজেকে জ্ঞানের সাথে নিজেকে জড়িয়ে রাখতেন। .... তিনি এমনসব কিতাব থেকে ইলম অর্জন করেছেন যা অন্য কেউ অর্জন করতে পারেনি। সালাফ ও খালাফদের কিতাব সম্পর্কে তার গভীর বুঝ ছিল।”

আস- সুয়ুতি বলেন, “তিনি তাফসীর, হাদিস, উসুল, ফুরু আর আরবি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন।”

মোল্লা আলী আল- কারী বলেন, “যে কেউই শারহ মানাযিলুস সাইরিন (অর্থাৎ, মাদারিজুস সালিকিন) বইটি বিশ্লেষণ করবে, তার কাছে এটি স্পষ্ট ও পরিস্কার হয়ে যাবে যে এই উম্মাহ’র মধ্যে তারা উভয়ই (অর্থাৎ, ইবনে তাইমিয়্যাহ আর ইবনুল কায়্যিম) আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা’আহ’র সবচেয়ে প্রবীণ আলিমদের মধ্যে আর আল্লাহ’র আওলিয়াদের মধ্যে দুজন আলিম।”

ইবনে নাসিরুদ্দিন আদ- দিমিশকি বলেন, “তিনি বিভিন্ন ইসলামিক বিদ্যার অধিকারী ছিলেন, বিশেষ করে তাফসীর ও উসুল বিদ্যার।”

<u>যুহদ ও ইবাদাতঃ</u>

ইবনে রজব বলেন, “বিনিদ্র রজনী যাপনে অভ্যস্ত ইবনুল কায়্যিম ছিলেন খুব ইবাদাত প্রেমিক। খুব দীর্ঘ ও প্রশান্তিপূর্ণ হতো তার সালাত। সবসময়ই তার জবান যিকিরে সজীব থাকতো। হৃদয়ে ছিল আল্লাহ- প্রেম ও আল্লাহতে সমর্পিত হওয়ার এক উদ্বেলিত ভাব। পবিত্র মুখায়বে ছিল আল্লাহ’র হুজুরে নিজের দৈন্য ও নিঃস্বতা এবং অসহায়ত্ব ও দীনতা প্রকাশের এক নূরানী দীপ্তি। এ দুর্লভ ভাবের অভিব্যক্তিতে আমার মনে হয়েছে তিনি সত্যিই অনন্য ও অতুলনীয়। কয়েকবার হাজ্জ সম্পাদন করা ছাড়াও দীর্ঘদিন তিনি মক্কায় অবস্থান করেছেন। মক্কাবাসীরা তার সার্বক্ষণিক ইবাদাত ও তাওয়াফের বিস্ময়কর সব ঘটনা শুনিয়ে থাকেন।”

ইবনে কাসির বলেন, “তিনি প্রচুর সালাত আদায় করতেন আর প্রচুর পরিমানে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তার চরিত্র ছিল খুবই চমৎকার, তিনি খুবই স্নেহপরায়ণ ও বন্ধুত্বপরায়ণ ছিলেন। ... বড় ভালোবাসার মানুষ ছিলেন তিনি। হিংসা

তার স্বভাবেই ছিল না। কাউকে কষ্ট দেওয়া বা হেয় করা তিনি জানতেন না। তার একজন অতি প্রিয় সহচর হিসাবে সমসাময়িক দুনিয়ায় তার চেয়ে ইবাদাত পাগল ও নফল প্রেমিক কেউ ছিল কিনা তা আমার জানা নেই। দীর্ঘ রুকু সিজদাহসহ বড় প্রশান্তিপূর্ণ সালাত আদায় করতেন তিনি। সাথীদের মুখে এজন্য তাকে তিরস্কারও শুনতে হতো, কিন্তু এ স্বাদের জিনিষ পরিত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। মোটকথা, গুনে ও কর্মের বিচারে তার তুলনা পাওয়া দুস্কর।”

সংগ্রামী জীবনঃ

ইবনুল কায়্যিমের জীবনের সময়টাতে দ্বন্দ্ব- বিবাদ ও অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিলো। এছাড়াও ইসলামিক রাষ্ট্রকে ভয়প্রদর্শনকারী বাহ্যিক হুমকিও ছিল। এই কারনে তিনি বিভক্ত হওয়া ও অনৈক্যকে প্রত্যাখ্যান করার এবং আল্লাহ’র কিতাব ও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে রাখার আদেশ করতেন।

তার লক্ষ্যগুলোর মধ্যে একটি লক্ষ্য ছিল দ্বীন ইসলামের মূল ও বিশুদ্ধ উৎসের দিকে উম্মাহকে ফিরিয়ে আনা এবং একে বিদআত ও কামনা- বাসনা থেকে পরিশুদ্ধ করা। তাই তিনি অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ) করার মাযহাবকে ধ্বংস করার আর সালাফদের মাযহাবে ফিরে আসার এবং তাদের পথ ও পদ্ধতির উপর থেকে এগিয়ে যাওয়ার আহবান করলেন। আর এ কারনেই দেখা যায়, তিনি নিজেকে কেবল হানবালি মাযহাবে সীমাবদ্ধ করে রাখেননি, বরং প্রায়ই তিনি অন্যান্য বিভিন্ন মাযহাব থেকে মতামত গ্রহণ করতেন অথবা এমন হতো যে তিনি এমন এক মতামত দিলেন যেটি কিনা অন্যান্য সকল মাযহাবের মতামতের বিরোধী। এ কারনে ইজতিহাদ করা আর তাকলীদকে প্রত্যাখ্যান করাটাই ছিল তার মাযহাব। এর ফলে তাকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। তার শাইখ ইবনে তাইমিয়্যাহ আর তাকে একই কারাগারে রাখা হয়, অবশ্য তাদেরকে পৃথক করেই রাখা হয়। ইবনে তাইমিয়্যাহ’র মৃত্যুর পর তাকে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

তার দীর্ঘ বন্দী জীবনের সবটুকু সময় কেটেছে কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়ন নিমগ্নতায়। ইবনে রজব এ ব্যাপারে বলেন, “বন্দী জীবন তার জন্য খুবই কল্যাণকর হয়েছিলো। সে সময়টাতে তিনি এমন গভীর প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান লাভ করেছিলেন যে, তত্ত্বজ্ঞানীদের জটিল ও সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করা তার জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তার রচনা- সমগ্র এ ধরণের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ।”

তার ছাত্রঃ

তার অনেক ছাত্র ছিল, তাদের মধ্যে কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেনঃ ইবনে কাসির, আয- যাহাবী, ইবনে রজব, ইবনে আবদুল হাদি এবং তার দুই পুত্র ইব্রাহীম আর শারাফুদ্দিন আবদুল্লাহ।

তার কর্মঃ

আল- নুমান আল- আলসি আল- বাগদাদি বলেন, “তার তাফসীর সঠিকতার দিক থেকে অনন্য।”

আত- তাহাবি বলেন, “রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস উল্লেখ ও এর বর্ণনা দেওয়ার ব্যাপারে তিনি খুবই গুরুত্ব দিতেন।”

শাইখ বুরহানুদ্দিন আল- যারি বলেন, “ইবনুল কায়্যিমের সময়টাতে তার মতো জ্ঞানী ব্যক্তি আর কেউই ছিলো না।”

ইবনুল কায়্যিম ষাটটির বেশী কিতাব রচনা ও সংকলন করেছিলেন। তার লিখনিতে অন্তর ছুঁয়ে যাওয়ার এক অনন্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এছাড়াও তার লিখনিতে যথাযথতা, স্পষ্টতা, যুক্তির প্রবলতা আর গবেষণার গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। তার রচিত ও সংকলিত কিতাবসমূহের মধ্যে কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলঃ

হাদিস ও সিরাত সম্পর্কিত - তাহযিব সুনান আবু দাউদ, আল- মানারুল মুনিফ, ফাওা’ইদ আল- হাদিসিয়্যাহ, জালা’উল আফহাম, যাদুল মা’আদ।

ঈমান সম্পর্কিত - ইজতিমা’ আল- জুয়ুশ আল- ইসলামিয়্যাহ, আস- সাওা’ইকুল মুরসালাহ, শিফা’উল ‘আলিল, হাদিয়ুল আরওয়াহ, আল- কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ, কিতাবুর রুহ।

আখলাক ও তাযকিয়্যাহ সম্পর্কিত - মাদারিজুস সালিকিন, আদ- দা’ওয়াদ দাওয়া’, আল- ওয়াবিলুস সায়্যিব, আল- ফাওা’ইদ, রিসালাতুত তাবুকিয়্যাহ, মিফতাহ দারুস সা’আদাহ, ‘উদ্দাতুস সাবিরিন।

কুরআন বিদ্যা সম্পর্কিত - আত- তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন, আমসালুল কুরআন।

ভাষাগত ও বিবিধ ইস্যু সম্পর্কিত - বাদা’ই আল- ফাওা’ইদ।

ইবনুল কায়্যিমের বিভিন্ন লিখনি থেকে ব্যাখ্যামূলক মন্তব্য সঙ্কলন করে দুটো বই সম্পাদনা করা হয়েছে, এগুলো হল - তাফসীরুল কায়্যিম এবং তাফসিরুল মুনির।

তার কিছু উক্তিঃ

“তিনি সৃষ্টি করেছেন সাত সাগর, তবুও তিনি তার প্রতি ভয়বশত আপনার চোখের এক ফোঁটা অশ্রু দেখতে ভালোবাসেন, অথচ আপনার চোখদুটো অশ্রুবিহীন!”

“সত্যিকারের মানুষ তো সে- ই, যে তার অন্তরের মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় করে, তার শারীরিক মৃত্যুকে নয়।”

“কোন ছোট পাপকেই তাচ্ছিল্য করবেন না, কারন ক্ষুদ্রতম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থেকেই বৃহত্তম অগ্নিকান্ড ঘটতে পারে।”

“বাজে চিন্তাকে তাড়িয়ে দিন, যদি এটি না করেন তবে সেটি একটা উদ্দেশ্যে পরিণত হবে। তাই বাজে উদ্দেশ্যকে তাড়িয়ে দিন, নতুবা সেটি একটি কামনা- বাসনায় পরিণত হবে। সুতরাং কামনা- বাসনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করুন, যদি না করেন তবে সেটি একটি সংকল্প ও গভীর আসক্তিতে পরিণত হবে।”

“পাপকে অবশ্যই জ্বালিয়ে দেওয়াটা দরকার - হয় অনুতাপের যন্ত্রণা দিয়ে, নতুবা পরকালে দোযখের আগুন দিয়ে।”

“এই দ্বীন (ইসলাম) নিজেই একটি নৈতিক আচরণ। তাই আপনার আচার- আচরণের তুলনায় যে ব্যক্তি আপনার থেকেও এগিয়ে থাকবে, দ্বীন পালনে সে- ই আপনার থেকে উত্তম।”

“পাপগুলোর শাস্তি হিসেবে এটিই যথেষ্ট যে আপনি আল্লাহ’র ইবাদাত করতে চাওয়া সত্ত্বেও সেই পাপগুলো আপনাকে তার ইবাদাত করতে বাধা দিবে।”

“আল্লাহ চোখকে অন্তরের আয়না বানিয়েছেন। তাই গোলাম যদি তার দৃষ্টিকে অবনত করে, তবে তার অন্তর এর কামনা- বাসনাকে অবনত করবে। আর যদি সে তার দৃষ্টিকে বাধাহীন করে দেয়, তবে তার অন্তরও এর কামনা- বাসনাকে বাধাহীন করে দিবে।”

“অন্তর বেঁচে থাকাটা নির্ভর করে কুরআন দিয়ে প্রতিফলিত হওয়া, গোপনে আল্লাহ’র সামনে নম্র থাকা আর পাপ বর্জন করার উপর।”

“আপনি যদি পরীক্ষা করে দেখতে চান যে আল্লাহ্‌কে আপনি কতটুকু ভালোবাসেন, তবে দেখুন যে আপনার অন্তর কুরআনকে কত ভালবাসে, আপনি জবাব পেয়ে যাবেন।”

“এই দুনিয়া হল একটি সেতু, আর একটি সেতুকে নিজের আবাস হিসেবে গ্রহণ করাটা উচিত নয়।”

“কি আশ্চর্য! আপনার কাছ থেকে অল্প কিছু হারিয়ে গেলে আপনি কাঁদেন, অথচ আপনার পুরো জীবনটাই ক্ষয়ে যাচ্ছে আর আপনি হাসছেন!”

“অন্তর যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে হারাম কাজগুলো আকর্ষণীয় হয়ে যায় আর আল্লাহ’র আনুগত্য করাটা এমন কাজ হয়ে যায় যাকে অবজ্ঞা সহকারে দেখা হয়।”

“আল্লাহ আপনাকে কখনোই ধ্বংস করার জন্য পরীক্ষা করেন না। তিনি আপনার হাত খালি করার মাধ্যমে আপনার কাছ থেকে কিছু দূর করে দেন এর থেকেও উত্তম কিছু উপহার দেওয়ার জন্য।”

“দুর্দশাগ্রস্ত হওয়া ছাড়া অন্তর কখনোই ধর্মপরায়ণ ও বিশুদ্ধ হবে না। এটি স্বর্ণকে বিশুদ্ধ করার মতোই, স্বর্ণ থেকে এর নিকৃষ্ট ধাতুগুলো অপসারন করা ছাড়া স্বর্ণ কখনোই বিশুদ্ধ হয় না।”

“অন্তরে গানের প্রতি ভালোবাসা আর কুরআনের প্রতি ভালোবাসা কখনোই একসাথে থাকতে পারে না, অন্তরে এই দুটি অবস্থান করলে এদের একটি অপরটিকে বিতাড়িত করে।”

“আল্লাহ’র কাছে কোন কিছুর চাওয়া থামিয়ে দিলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হোন, আর মানুষের কাছে কিছু চাওয়া হলে সে অসন্তুষ্ট হয়।”

“আপনি যখন কোন সৃষ্টিকে ভয় করবেন তখন এর দ্বারা প্রতিহত হওয়া অনুভব করবেন আর এটি থেকে পালিয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি যখন সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করবেন তখন আপনি নিজেকে তার নিকটে অনুভব করবেন আর তার দিকে দৌড়িয়ে যাবেন।”

“অন্তর যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতি যুক্ত থাকে, তবে সে যেটির সাথে যুক্ত আছে, আল্লাহ তাকে সেটির উপরই নির্ভরশীল করে দিবেন আর সে ব্যক্তি সেটি দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হবে।”

"কোন ব্যক্তিকে কিভাবে সুস্থ প্রকৃতির হিসেবে বিবেচনা করা যায়, যে কিনা শুধু একটিমাত্র লালসাপূর্ণ ঘণ্টার বদলে জান্নাত ও এর অভ্যন্তরে যা আছে সব কিছুই বিক্রি করে দেয় ?"

"প্রকৃতপক্ষে অন্তরে রয়েছে এক অভাববোধ, যা আল্লাহ'র সাথে সম্পর্ক করা ছাড়া দূর হয় না। অন্তরে রয়েছে এক বিষণ্নতা, যা আল্লাহ্‌কে জানা আর তার প্রতি সৎ থাকা ছাড়া দূর হয় না। অন্তরে আরও রয়েছে একটি শুন্যতা, যা তাকে ভালোবাসা ও তাওবা করে আল্লাহ'র দিকে ফিরে যাওয়া আর সবসময় তাকে স্মরণ করা ছাড়া পূরণ হয় না। কোন ব্যক্তিকে যদি পুরো দুনিয়া আর এর সব কিছুই প্রদান করা হয়, তবুও এটি তার শুন্যতা পূরণ করতে পারবে না।"

"একজন ব্যক্তির জবান আপনাকে তার অন্তরের স্বাদ দিতে পারে।"

"আল্লাহ'র ইবাদাত ও আনুগত্য অন্তরকে আলোকিত ও শক্তিশালী করে আর অটল রাখে, যতক্ষণ না পর্যন্ত এটি পরিস্কার আয়নার মতো হয়ে যায়, যা আলো দ্বারা চকচক করে। শয়তান যখন এই অন্তরের নিকটবর্তী হয়, সে এর আলো দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেই শয়তানদের মতো, যারা আসমানে আড়ি পেতে শোনার চেস্টা করলে তাদেরকে তারকা নিক্ষেপের মাধ্যমে আঘাত করা হয়। আর একটি সিংহ থেকে নেকড়ে যেভাবে পালিয়ে যায়, শয়তান এই অন্তর থেকে এর থেকেও বেশী ভয় নিয়ে পালিয়ে যায়।"

"এই পার্থিব জীবন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হবেন না কারন এটি তো আল্লাহ'র জন্যই। রিযকের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবেন না কারন এটি আল্লাহ'র পক্ষ থেকে আসে। ভবিষ্যতের ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করবেন না কারন এটি তো আল্লাহ'র হাতে। আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার কাজ করে যেতে থাকেন। কারন আপনি যদি তাকে সন্তুষ্ট করেন তবে তিনি আপনাকে সন্তুষ্ট করবেন, আপনার অভাব পুরন করে দিবেন আর আপনাকে সমৃদ্ধ করে দিবেন।"

"হে সবরকারীদের পদযুগল, যেতে থাকো, কারন কেবলমাত্র আর অল্পই তো বাকি আছে। ইবাদাতের মধুরতা মনে রাখবে, তাহলে কঠোরভাবে চেষ্টা করে যাওয়ার তিক্ততা তোমার কাছে আরো সহজ হয়ে যাবে।"

"তার নিয়্যতই সবচেয়ে ভালো, যিনি তার রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন।"

"নারীরা হলেন সমাজের অর্ধেক, আর তারা সমাজের অপর অর্ধেকের জন্ম দেন; তাই ব্যাপারটি যেন এমন যে তারা নিজেরাই হলেন পূর্ণ সমাজ।"

"কুরআনের অনুসারী তো তারাই, যারা এটি পাঠ করে আর এর উপর আমল করে, যদিও তা তাদের হিফয করা না থাকে।"

"তিনটি বিষয় দ্বারা সুখ অর্জিত হয় - পরীক্ষার সময় সবর করা, অনুগ্রহ পাওয়ার সময় শোকরগুজার থাকা এবং পাপ করলে অনুতপ্ত হওয়া।"

"আল্লাহ ও তার সাথে সাক্ষাতের জন্য আকুল আকাংখা করার ব্যাপারটি হল অন্তরের উপর মৃদুমন্দ বাতাস বয়ে যাওয়ার মত, যা দুনিয়ার আগুনকে নিভিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি তার অন্তরকে তার রবের সাথে নির্দিষ্ট করে নিবে, সে স্থির ও প্রশান্তিপূর্ণ অবস্থায় থাকবে। আর যে তার অন্তরকে লোকদের মধ্যে পাঠিয়ে দিবে, সে গোলমাল ও অতিশয় অস্থির অবস্থায় থাকবে।"

“কাফিরদের মধ্যে অপরিচিত হল একজন মুসলিম, মুসলিমদের মধ্যে অপরিচিত হল একজন মুমিন, আর মুমিনদের মধ্যে অপরিচিত হল একজন মুহসিন।”

“পাপ অন্তরকে সেভাবে ধ্বংস করে যেভাবে বিষ ধ্বংস করে শরীরকে।”

“আন্তরিকতা ছাড়া আমল করার ব্যাপারটি হল সেই মুসাফির ব্যক্তির মত, যে তার পানির পাত্রে ময়লা বহন করে; এটি বহন করা তার জন্য একটি বোঝা আর এটি কোন উপকারেই আসে না।”

“এই পার্থিব জীবন তো একটি ছায়ার মতোই। আপনি যদি একে ধরতে চান তবে কখনোই তা করতে পারবেন না। যদি আপনি এটি থেকে নিজের মুখ ঘুরিয়ে এর প্রতি পিঠ প্রদর্শন করেন, তবে আপনাকে অনুসরণ করা ছাড়া আর এটির কোন উপায় থাকবে না।”

“সত্যের পথে যাও আর এক্ষেত্রে একাকী বোধ করো না, কারন অল্পসংখ্যক লোকই এই পথ গ্রহণ করেন। বাতিল পথের ব্যাপারে সতর্ক থেকো, ধ্বংসপ্রাপ্তদের সংখ্যাধিক্য দ্বারা প্রতারিত হয়ো না।”

“কুনজর দেয় এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই হিংসুক, তবে প্রত্যেক হিংসুক ব্যক্তিই কুনজর দেয় না।”

“টাকা যখন আপনার হাতে থাকবে তবে অন্তরে থাকবে না, এটির কারনে আপনার ক্ষতি হবে না যদিও অধিক পরিমাণে টাকা আপনার কাছে থাকে। কিন্তু টাকা যদি আপনার অন্তরেই থাকে, তবে আপনার হাতে কোন টাকা না থাকলেও তা আপনার ক্ষতি করবে।”

“দুনিয়াতে জবান ছাড়া এমন আর কিছুই নেই যেটিকে গুরুতরভাবে কারারুদ্ধ করা প্রয়োজন।”

“পাপের অনেক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে, তার মধ্যে একটি হল এই যে, পাপ আপনার কাছ থেকে জ্ঞান ছিনিয়ে নিবে।”

তার মৃত্যুঃ

তার মৃত্যুর তারিখের ব্যাপারে ঐক্যমত আছে যে তিনি ৭৫১ হিজরি সনের ১৩ই রজব বৃহস্পতিবার রাতে এশা’র আযানের সময় ইন্তিকাল করেন। পরদিন যোহরের সালাতের পর প্রথমে আল- জামি’ আল- উমাওি এবং এরপর জামি’ জারাহ তে তার জানাযার সালাত আদায় করা হয়। বিপুল সংখ্যক লোক তার জানাযায় অংশগ্রহন করেছিলো।

ইবনে কাসির বলেন, “তার জানাযা লোকে পরিপূর্ণ ছিল, আল্লাহ তার উপর করুণা করুন। এই জানাযার সাক্ষী ছিলেন বিচারকগণ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বরা এবং সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিরা – সাধারণ লোক ও অভিজাত শ্রেণী উভয় পক্ষ থেকেই। তার খাটিয়া বহন করার জন্য লোকেরা ভিড় করেছিলো। দামাস্কাসের কবরস্থান আল- বাব আস- সাগির এ তার মায়ের কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়, আল্লাহ তাদের উভয়কেই ক্ষমা করুন।”

মহান আল্লাহ ইবনুল কায়্যিম (রহ.) কে ক্ষমা করুন এবং তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস প্রদান করুন, আমীন।

অন্তরের ধরণসমূহ [৬০]

জীবন ও মৃত্যুর অধিকারী হিসেবে বর্ণিত হওয়ায় অন্তরকে তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায় –

সুস্থ ও বিশুদ্ধ অন্তর

এটি হল সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ (সালি-ম) অন্তর। এটিই সেই একমাত্র ধরনের অন্তর, যা নিয়ে একজন ব্যক্তি বিচার দিবসে আল্লাহ'র সামনে হাজির হতে পারলে মুক্তি পেয়ে যাবে। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّـهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩)

"যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহ'র নিকট আসবে একটি সুস্থ অন্তর নিয়ে।" (সূরা শু'আরা', ২৬ : ৮৮-৮৯)

'সালি-ম' (নিশ্চিত নিরাপদ) এর অর্থ হল 'সা-লিম' (নিশ্চিত নিরাপদ ব্যক্তি)। এটি এই গঠনে এসেছে কারন এটি একটি সহজাত গুণ বা বর্ণিত বিষয়ের বর্ণনাকে ফুটিয়ে তোলে; যেমনটি এটি ব্যাকরণগতভাবে লম্বা (তাউইল), খাটো (কাসির) অথবা ক্ষমাপূর্ণ ও কমনীয় (যারিফ) শব্দের অনুরূপ।

এ কারনে, যার অন্তরকে 'সালি-ম' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অন্তরে সত্যনিষ্ঠতা ও সুস্থতার গুণ অন্তরের ধ্রুব ও প্রতিষ্ঠিত স্বভাব হওয়ার কারনেই একে এই নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এটি হল 'আলিম (যিনি জানেন) ও কাদির (যার ক্ষমতা রয়েছে) - এ দুটো শব্দের মতো। এটি মারিদ (ব্যাধিগ্রস্ত), সাকিম (অসুস্থ) আর 'আলিল (পীড়িত) এর বিপরীত।

সুস্থ ও সত্যনিষ্ঠ অন্তর সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু সেগুলোর সবই প্রদত্ত মৌলিক ধারণার মধ্যেই ঘুরেফিরে রয়েছে –

"সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ অন্তর হল সেটিই, যেটি আল্লাহ'র আদেশ ও নিষেধ বিরোধী প্রত্যেক জাগতিক কামনা-বাসনা থেকে নিরাপদ। এই অন্তর প্রত্যেক সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা থেকে নিরাপদ, যা আল্লাহ'র দেওয়া বর্ণনা গোপন বা তার বিরোধীতা করবে। এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি দাসত্ব প্রদর্শন করা থেকে নিরাপদ, ঠিক যেভাবে এটি নিরাপদ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো নিকট বিচার-মীমাংসা চাওয়া থেকে। কাজেই এটি আল্লাহ্‌কে ভালোবাসা এবং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর বিধিবিধান অনুসন্ধানের মাধ্যমে সুস্থতা লাভ করে।

এটি সুস্থতা লাভ করে আল্লাহ্‌কে ভয় করার মাধ্যমে এবং তার প্রতি আশা, আস্থা ও ভরসা, পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া আর নম্রতার মাধ্যমে। প্রত্যেক পরিস্থিতে যেটি করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হবেন সে সেটিই করে, আর সে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সে এমন সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখে যেগুলো আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করবে। এটিই হল দাসত্বের (‘উবুদিয়্যাহ) বাস্তবতা, যা একমাত্র আল্লাহ’র প্রতিই করা যায়।”

কাজেই, সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ অন্তর হল এমন এক অন্তর, যত যা কিছুই ঘটুক না কেন এটি যেকোন প্রকার শিরক থেকে নিরাপদ এবং এর দাসত্ব কেবলমাত্র সম্পূর্ণরূপে ও বিশুদ্ধরূপে মহিমান্বিত আল্লাহ’র জন্যই। এর কামনা- বাসনা, ভালোবাসা, আস্থা ও ভরসা, পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া, নম্রতা, ভয় ও আশা শুধুমাত্র আল্লাহ’র জন্যই এবং এর কর্মও সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধভাবে তারই জন্য। তাই এই অন্তর যদি ভালবাসে তবে আল্লাহ’র জন্যই ভালবাসে; যদি ঘৃণা করে তবে আল্লাহ’র জন্যই ঘৃণা করে; যদি কিছু প্রদান করে তবে সেটি আল্লাহ’র জন্যই প্রদান করে; আর এটি যদি কিছু প্রদান করাকে প্রত্যাখ্যান করে তবে সেটিও আল্লাহ’র জন্যই করে।

তবে কেবল এটিই অন্তরের জন্য পর্যাপ্ত হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত অন্তর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া অন্য কারো প্রতি বশ্যতা স্বীকার করা ও অন্য কারো থেকে ফয়সালা চাওয়ার ব্যাপারে নিরাপদ হবে। সুতরাং রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে অন্তর একটি দৃঢ় সম্পর্কের বন্ধন গড়ে, দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তার (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করে এবং কথা ও কাজে কেবল তাকেই (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) মান্য করে। এই কথাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে অন্তর সম্পর্কিত কথা, অর্থাৎ ঈমানের বিষয়সমূহকে; আর মুখ নিঃসৃত কথা তা- ই বহন করে যা অন্তর ধারণ করে। এই কর্মগুলো অন্তরের কর্মসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে - এর কামনা- বাসনা, অপছন্দ আর অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহকে আর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের আমলসমুহকে।

সুতরাং, এসব বিষয়াদির ছোট ও বড় সব কিছুর মীমাংসা হবে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) যা সহকারে আমাদের কাছে এসেছেন তা দিয়েই। এ কারনে ঈমান, কথা বা কর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যাপারে অন্তর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে নিজেকে আগ বাড়িয়ে রাখে না। আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّـهَ ۚ إِنَّ اللَّـهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١)

“হে ইমানদারগণ, আল্লাহ ও তার রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না ...।” (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১)

অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন ব্যাপারে কথা বলার আগ পর্যন্ত তোমরা সে বিষয়ে কথা বলবে না এবং তিনি কিছু আদেশ করা আগ পর্যন্ত তোমরা সে কাজ সম্পাদন করবে না।

সালাফদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি বলেন, “ ‘কেন ?’ এবং ‘কিভাবে ?’ - এ দুটো সাক্ষ্য উন্মোচন করা ছাড়া কোন আমল হয় না, যদিও তা ক্ষুদ্র আমল হয়ে থাকে।”

অর্থাৎ, কেন আপনি কাজটি করেছেন ? কিভাবে করেছেন ?

প্রথম প্রশ্নটি দিয়ে কাজের কারন, সূত্রপাত ও অনুপ্রেরণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে - কাজটি কি লোকদের প্রশংসা অর্জনের মতো কোন দ্বীন বিরোধী আর পার্থিব কিছু অর্জনের জন্য করা হয়েছে ? এটি কি লোকদের নিন্দার ভয়ে করা হয়েছে ? নাকি সেই কাজের অনুপ্রেরনা ছিল দাসত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত আল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসা ও নৈকট্য বৃদ্ধি করা এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার নিমিত্ত অন্বেষণ করা ?

এই প্রশ্নের সারমর্ম হল এই যে, আপনার মালিকের জন্য বা ব্যক্তিগত অর্জন ও হীন কামনা-বাসনার জন্য এই কাজ সম্পাদন করা কি আপনার উপর ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন দিয়ে এই ইবাদাতের কাজে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে - আপনি যে কাজটি করলেন সেটি কি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কোন কথা দ্বারা আইন বিধিবদ্ধ করে দেওয়া কাজের মধ্যে পড়ে ? নাকি সেটি এমন একটা কাজ যেটি তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আইন বিধিবদ্ধ করেননি আর যেটির ব্যাপারে তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সন্তুষ্টও নন ?

সুতরাং, প্রথম প্রশ্নটি ইখলাস (আন্তরিকতা) সম্পর্কিত আর দ্বিতীয় প্রশ্নটি মুতাবা'আহ (অনুসরণ করা) সম্পর্কিত। এই দুটো পূর্বশর্তের সম্মেলন ঘটা ছাড়া আল্লাহ কোন আমলই কবুল করবেন না।

প্রথম প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত পাপমোচনের পদ্ধতি হল ব্যক্তির ইখলাসকে (আন্তরিকতাকে) বিশুদ্ধ করা, এটি শুধুমাত্র আল্লাহ'র জন্যই হতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত পাপমোচনের পদ্ধতি হল রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণকে বাস্তবে কার্যকর করা এবং ইখলাসের ক্ষতি করে এমন কোন উদ্দেশ্য থেকে আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে অনুসরণ করার ব্যাপারে ক্ষতি করে এমন কোন হীন কামনা-বাসনা থেকে অন্তরকে সুরক্ষিত রাখা।

এটিই হল সুস্থ ও সত্যনিষ্ঠ অন্তরের বাস্তবতা, যেটি থেকে বিজয় ও সুখ ঘটে।

মৃত অন্তর

এটি এমন এক অন্তর যার কোন প্রাণ নেই। এটি তার রবকে জানে না এবং তার রবের আদেশের প্রতি অনুগত থাকার মাধ্যমে আর রব যা ভালোবাসেন ও যা করলে সন্তুষ্ট হোন সেগুলো করার মাধ্যমে সে রবের ইবাদাত করে না। এর পরিবর্তে এটি এর জাগতিক কামনা-বাসনা, লোভ-লালসা ও আনন্দের গোলাম; এগুলো কি তাদের রবের অসন্তুষ্টি আর ক্রোধের দিকে পরিচালিত করছে কিনা সে ব্যাপারে এটি অমনোযোগী ও উদাসীন। কাজেই এটি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদাত করে; আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর প্রতিই এর ভালোবাসা, আশা, আনন্দ, বিরক্তি, প্রশংসা থাকে আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি আত্মসমর্পণ করে। যদি এটি কিছু ভালবাসে তবে সেই ভালোবাসা হয় এর হীন কামনা-বাসনার জন্য, আর যদি কিছু ঘৃণা করে তবে সেটিও হয় এর হীন কামনা-বাসনার জন্য, যদি এটি কিছু প্রদান করে তবে সেটি হয় এর

কামনা- বাসনার জন্য, যদি প্রদান করা অস্বীকার করে তবে সেটিও এর হীন কামনা- বাসনার জন্যই। এটি এর হীন কামনা- বাসনাকে অগ্রাধিকার দেয় এবং এর মালিককে সন্তুষ্ট করার চাইতে এগুলোই তার কাছে অধিকতর প্রিয়।

হীন কামনা- বাসনাই হল এর নেতা, জাগতিক কামনা- বাসনা এর সেনাপতি, অজ্ঞতা এর চালিকাশক্তি এবং অমনোযোগিতা হল জাহাজ - যার উপর এটি আরোহণ করে। এটি এর জাগতিক কামনা- বাসনার অনুসরণে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত। এর হীন কামনা- বাসনা আর জাগতিক বিষয়গুলোর নেশায় এটি উন্মত্তভাবে পরিচালিত হয়। আল্লাহ ও পরকালের আবাসের আহবান সে বহুদূরবর্তী স্থান থেকে শোনে এবং আন্তরিক উপদেশদাতার প্রতি কোন সাড়া দেয় না। সে প্রতিটি ধূর্ত শয়তানকে অনুসরণ করে এবং দুনিয়াই এর ক্রোধ ও আনন্দের কারন হয়ে থাকে। হীন কামনা- বাসনা একে বধির করে দেয় এবং সেই সাথে মিথ্যা ব্যতীত সব কিছুর প্রতি অন্ধও করে দেয়। এই দুনিয়াতে এটি হল লাইলা সম্পর্কে যা বলা হয়েছিলো তারই অনুরূপ -

যেকোন শত্রুর প্রতি সে দেখায় শত্রুতা

এবং তাদের সাথে চলে যাদের সে পছন্দ করে

সে যে কারোরই নিকটবর্তী হয়

সেও ভালবাসে আর তার নিকটবর্তী হয়।

যে ব্যক্তির এই অন্তর রয়েছে, তার সাথে মেলামেশা করা হল একটি অসুস্থতা, তার সাথে আলাপচারিতা হল বিষ আর তার সাথে বসাটা হল ধ্বংস।

ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর

এটি এমন এক অন্তর যাতে প্রাণ রয়েছে আর একই সাথে একটি ত্রুটিও রয়েছে। এর রয়েছে দুটো তাড়না যা একে আহবান করে - একটি তাড়না একে জীবনের দিকে পরিচালিত করে আর অপরটি পরিচালিত করে মৃত্যুর দিকে। এই দুটোর মধ্যে যেটি এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে এটি তারই অনুসরণ করে।

এই অন্তর মহিমান্বিত আল্লাহ'র প্রতি ভালোবাসা, ঈমান, আন্তরিকতা, আস্থা ও নির্ভরতা বহন করে; এই বিষয়গুলো অন্তরের জীবনের জন্য অপরিহার্য।

এই অন্তর এর জাগতিক কামনা- বাসনা আর এগুলোকে পছন্দে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং এগুলো অর্জনের আগ্রহও ধারণ করে। এই অন্তরে আরও রয়েছে হিংসা, দাম্ভিকতা, আত্মঅহংকার আর নেতৃত্ব অর্জনের মাধ্যমে পদমর্যাদা লাভের ব্যাপারে ভালোবাসা - এ বিষয়গুলো অন্তরকে অবধারিতভাবে ধ্বংস ও সর্বনাশের দিকে পরিচালিত করে।

এই অন্তরটিকে প্রতিনিয়তই দুটো আহবানকারীর তাদের দিকে আহবান করার মাধ্যমে চেষ্টা করে যেতে থাকে - এদের মধ্যে একজন আহ্বানকারী আহবান করে আল্লাহ, তার রসুল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর পরকালের আবাসের

দিকে; অপরদিকে অন্য আহ্বানকারী একে আহবান করে দ্বীন বিরোধী জাগতিক বিষয়গুলোর দিকে। এই অন্তরটি সে সময়ে এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সবচেয়ে প্রভাবশালী আহবানকারীর আহবানে সাড়া দেয়।

সুতরাং, প্রথম প্রকারের অন্তর হল জীবিত, নম্র, কোমল, মনোযোগী ও সতর্ক অন্তর। দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর হল ভঙ্গুর, শুস্ক ও মৃত অন্তর। তৃতীয় প্রকারের অন্তর হল ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর - হয় এটি এর মুক্তির নিকটবর্তী অথবা এর ধ্বংসের নিকটবর্তী।

মহিমান্বিত আল্লাহ এই তিন প্রকার অন্তর সম্পর্কে বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّـهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّـهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّـهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢) لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّـهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥٤)

"আমি তোমার আগে এমন কোন নবী বা রসূল পাঠাইনি (যারা এ ঘটনার সম্মুখীন হয়নি যে) যখন সে (নবী আল্লাহ'র আয়াতসমুহ পড়ার) আগ্রহ প্রকাশ করলো তখন শয়তান তার সে আগ্রহের কাজে (কাফিরদের মনে) সন্দেহ ঢেলে দেয়নি, এরপর আল্লাহ শয়তানদের নিক্ষিপ্ত (সন্দেহগুলো) মিটিয়ে দেন এবং আল্লাহ নিজের আয়াতসমুহকে (আরো) মজবুত করে দেন, আল্লাহ (সবকিছু) জানেন, তিনি হলেন বিজ্ঞ কুশলী। (এর উদ্দেশ্য হল) যেন আল্লাহ (এর মাধ্যমে) শয়তানের প্রক্ষিপ্ত (সন্দেহ)- গুলোকে সেসব মানুষের পরীক্ষার বিষয় বানিয়ে দিতে পারেন, যাদের অন্তরে (আগে থেকেই মুনাফিকির) ব্যাধি আছে, উপরন্তু যারা একান্ত পাষাণ হৃদয়; অবশ্যই এ জালিমরা অনেক মতবিরোধ ও সন্দেহে নিমজ্জিত হয়ে আছে। (এটি এ কারনে,) যাদের (আল্লাহ'র কাছ থেকে) জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে, এটিই তোমার রবের পক্ষ থেকে আসা সত্য, এরপর তারা যেন তাতে (পুরোপুরি) ঈমান আনে এবং তাদের মন যেন সে দিকে আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, অবশ্যই আল্লাহ ইমানদারদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৫২-৫৪)

এই তিনটি আয়াতে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত আল্লাহ দুই ধরণের অন্তরকে পরীক্ষা করার এবং এক ধরণের অন্তরকে বিজয়ী করার কথা উল্লেখ করেছেন। যে দুই ধরণের অন্তরকে পরীক্ষা করার ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল ব্যাধিগ্রস্ত ও বাঁকা অন্তর। বিজয়ী অন্তর হল একজন মুসলিমের অন্তর যেটি তার রবের সামনে নম্র থাকে, এটি তার রবের প্রতি স্থির ও পরিতৃপ্ত এবং বাধ্য ও অনুগত থাকে।

অন্তর ও অন্যান্য অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে কামনা করা হয় যে এরা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে, এদের থাকবে না কোন ত্রুটি যাতে করে এগুলো তাদের প্রকৃতির সাথে খাপ খায় এমন কাজ করতে পারে এবং যে উদ্দেশ্যে এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। আল্লাহ'র আনুগত্যে ইস্তিকামা (অটল অবিচল থাকা) করার সীমার বাইরে চলে যাওয়ার কারণটি হতে পারে অন্তরের শুস্কতা ও কঠোরতার কারনে অথবা অন্তরের সম্পর্কে যেটি কামনা করা হয় অন্তরের সেটি করার অভাবে। এক্ষেত্রে এটি হল একটি বাকশক্তিহীন জবান বা অন্ধ চোখ বা আংশিকভাবে দেখতে পায় এমন চোখের মতো, এমনটা ঘটে থাকে কিছু প্রকার ব্যাধি বা ত্রুটির কারনে। এ কারনে অন্তরকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে –

(১) সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান অন্তর - যেটি কোন প্রতিবন্ধক বা অন্তরায় ধারণ করে না যা একে সত্য গ্রহণ করা, সেটিকে ভালোবাসা আর সেটি সম্পর্কে জানার পর এটিকে অন্য কিছু থেকে পছন্দে অগ্রাধিকার দেওয়া থেকে বাধা দিবে। কাজেই এর সত্যের বুঝ সঠিক আর এটি সত্যকে গ্রহণ করে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের সাথে।

(২) মৃত, কঠিন ও শুস্ক অন্তর - যেটি সত্যকে গ্রহণ করে না আর এর প্রতি আত্মসমর্পণও করে না।

(৩) ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর - যখন এর ব্যাধি প্রাধান্য বিস্তার করে তখন এটি মৃত ও শুস্ক অন্তরের সারিতে যোগ দেয়, কিন্তু যদি এর সুস্থতা প্রাধান্য বিস্তার করে তবে এটি সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ অন্তরের সারিতে যোগ দেয়।

শয়তানের দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রতি যা কিছু পরিচালিত হয়, যেমনঃ নিশ্চিতভাবে কিছু শব্দ শুনিয়ে দেওয়া বা অন্তরের প্রতি কিছু উত্থাপন করা - যেমনঃ সন্দেহ ও ধারণা - - এগুলো পরবর্তী দুই ধরণের অন্তরের জন্য পরীক্ষা হিসেবে কাজ করে এবং জীবিত, সত্যনিষ্ঠ ও সুস্থ অন্তরকে অধিকতর শক্তিশালী করে।

কারন জীবিত অন্তর এর সবকিছুই প্রত্যাখ্যান করে, অপছন্দ করে আর এটি দ্বারা রেগে যায়। কারন এই অন্তর জানে যে সত্য এর বিরোধীতা করে। কাজেই সুস্থ অন্তর সত্যের প্রতি আত্মসমর্পণ করে আর সেটি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। শয়তান যা দিয়ে প্রলুব্ধ করে, সুস্থ অন্তর সেই প্রতারণা সম্পর্কে জানে এবং এ কারনে সত্য সম্পর্কে এর দৃঢ় বিশ্বাস, এর প্রতি ভালোবাসা আর মিথ্যাকে প্রত্যাখ্যান করা বৃদ্ধি পায়।

এরপরেও পরীক্ষায় থাকা অন্তরে শয়তান কতৃক তার দিকে নিক্ষেপ করা সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব অবশিষ্ট থাকে। অপরদিকে, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান অন্তর শয়তান কতৃক এর প্রতি পরিচালিত কিছু দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

হুযাইফা বিন আল- ইয়ামান বলেছেন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "চাটাই বুননের মত এক এক করে ফিতনা মানুষের অন্তরে আসতে থাকে। যে অন্তরে তা গেঁথে যায়, তাতে একটি করে কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করবে, তাতে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়বে। এমনি করে দুটি অন্তর দুধরনের হয়ে যায়। একটি শ্বেত পাথরের মত; আসমান ও যমীন যতদিন থাকবে ততদিন কোন ফিতনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর অপরটি হযে যায় উল্টানো কাল কলসির মত, প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা সেঁধে দিয়েছে তা ছাড়া ভালমন্দ বলতে সে কিছুই চিনে না। " [৬১]

সুতরাং, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) পরীক্ষার সূত্রপাতের উপমা দিলেন অন্তরের উপর চাটাই বুননের মতো একটির পর একটি ফিতনা আসতে থাকার বর্ণনা দেওয়ার মাধ্যমে। অন্তর এসব পরীক্ষার প্রতি কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে সেটির উপর ভিত্তি করে তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) অন্তরকে এ দুটো প্রকারে বিভক্ত করেছেন –

(১) এমন এক অন্তর, যেটির প্রতি ফিতনা উন্মোচিত হলে সেটি ফিতনায় অনুপ্রবেশ করে, যেমন করে স্পঞ্জ পানিতে সিক্ত হয়ে যায়। কাজেই এর উপর একটি কালো দাগ হয় আর এটি এই ফিতনাগুলো গ্রহণ করতেই থাকবে এটি পরিপূর্ণভাবে কালো ও বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত। এটিই হল হাদিসে বর্ণিত “উল্টানো কাল কলসির মত”, যার অর্থ হল বিপর্যস্ত। এরপর যখন এটি কালো ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এটি প্রদত্ত দুটো ব্যাধির অধিনস্ত হয়ে পড়ে যা একে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় –

(ক) ভালো ও মন্দ সম্পর্কে এর এমন গোলমাল অবস্থা হয় যে, এটি ভালোটা জানে না আর মন্দটাও প্রত্যাখ্যান করে না। এটিও সম্ভব যে এর ব্যাধি ব্যক্তিকে ভালোকে মন্দ আর মন্দকে ভালো হিসেবে, সুন্নাহকে বিদাআত আর বিদআতকে সুন্নাহ হিসেবে এবং সত্যকে মিথ্যা আর মিথ্যাকে সত্য হিসেবে বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে প্রতারিত করবে।

(খ) বিচার মীমাংসা চাওয়ার সময় এটি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) যা সহকারে এসেছেন সেটিকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিবর্তে তার হীন কামনাকে অগ্রাধিকার দিবে ও সেটির প্রতি নিজেকে সমর্পণ করবে আর সেগুলো অনুসরণ করবে।

(২) সাদা অন্তর ঈমানের আলোয় স্থিরভাবে জ্বলন্ত আর এটি প্রকৃতই আলোকিত হয়। যখন এর প্রতি কোন ফিতনা উপস্থিত হয় তখন এটি তা প্রত্যাখ্যান করে আর এটিকে তাড়িয়ে দেয়, তাই এর আলো, সাদা দাগ আর শক্তি বৃদ্ধি পায়।

অন্তরের প্রতি উপস্থাপিত ফিতনাগুলো এর ব্যাধির কারন। সেগুলো হল জাগতিক কামনা আর সন্দেহের ফিতনা, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরাফিরা করা আর পথভ্রষ্টটার ফিতনা, পাপ ও বিদআতের ফিতনা এবং জুলুম আর অজ্ঞতার ফিতনা। প্রথম প্রকার ফিতনা (জাগতিক কামনা) পরিচালিত করে কামনা ও উদ্দেশ্যের বিকৃতির দিকে, এবং দ্বিতীয় প্রকার ফিতনা (সন্দেহ) পরিচালিত করে জ্ঞান ও ঈমানের বিকৃতির দিকে।

সাহাবীরা অন্তরকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যেমনটা নির্ভরযোগ্যরূপে বর্ণিত হয়েছে হুযাইফা বিন আল-ইয়ামান (রাঃ) থেকে – “চার প্রকারের অন্তর রয়েছে – (১) এমন অন্তর যা কেবলমাত্র আলোকিত হয় একটি উদ্দীপ্ত আলোকদানী দ্বারা, এটি হল একজন মুমিনের অন্তর; (২) এমন অন্তর যা আবৃত অবস্থায় রয়েছে, এটি হল কাফিরের অন্তর; (৩) এমন অন্তর যা বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এটি হল মুনাফিকের অন্তর, সে কেবল প্রত্যাখ্যান করতেই জানতো আর সে কেবল অন্ধ হওয়ার জন্যই দেখতো; (৪) এমন অন্তর যেটির দুটো তাড়নাই রয়েছে, একটি তাড়না একে ঈমানের দিকে আহবান করে আর অপর তাড়না আহবান করে নিফাকের দিকে, এরপর এটি এর অগ্রবর্তী তাড়নার অধীনস্ত হয়ে পড়ে।” [৬২]

“এমন অন্তর যা কেবলমাত্র …” – এর অর্থ হল, এটি এমন এক অন্তর যেটি আল্লাহ ও তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) ছাড়া সকল কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে। এ কারনে এটি সত্য ছাড়া সব কিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও সুরক্ষিত করে রাখে।

“আলোকিত হয় একটি উদ্দীপ্ত আলোকদানী দ্বারা” – এটি দিয়ে প্রকৃত ঈমানকে নির্দেশ করা হয়েছে। “কেবলমাত্র” – দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে এটি মিথ্যা সন্দেহ আর বিভ্রান্ত জাগতিক কামনা থেকে সুরক্ষিত। “একটি উদ্দীপ্ত আলোকদানী” – দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে অন্তরটি জ্ঞান ও ঈমানের আলো দিয়ে স্থিরভাবে প্রজ্জলিত ও আলোকিত হয়েছে।

“আবৃত অন্তর” – দ্বারা কাফিরের অন্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে। কারন এটি একটি আবরণ দ্বারা আবৃত ও আচ্ছাদিত, তাই জ্ঞান ও ঈমানের আলো এতে পৌঁছাতে পারে না। আল্লাহ ইহুদীদের সম্পর্কে বলেন,

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ

"এবং তারা বলেঃ আমাদের অন্তর আবৃত ...।" (সূরা বাকারাহ, ২ : ৮৮)

সত্য প্রত্যাখ্যান করা আর তা গ্রহণ করার ব্যাপারে অতি অহংকারের কারনে আল্লাহ শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরকে এই আবরণ দিয়ে আবৃত করে রাখেন। সুতরাং, এটি হল অন্তরের উপর একটি আবরণ, কানের জন্য সীলমোহর এবং চোখের জন্য অন্ধত্ব। এটি হল চোখের উপর থাকা এক অদৃশ্য পর্দা, যেটি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٤٥) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ۚ

"এবং তুমি যখন কুরআন পাঠ করো তখন তোমার আর যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের মধ্যে এক অদৃশ্য পর্দা রেখে দেই। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কানে (দিয়েছি) বধিরতা।" (সূরা আল- ইসরা, ১৭ : ৪৫- ৪৬)

এই ধরণের অন্তর বিশিষ্ট লোকদের যখন তাদের তাওহীদকে বিশুদ্ধ করার ও ইত্তিবা (অনুসরণ) করার উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা খুব দ্রুত দৌড়ে পালায়!

"বিপর্যস্ত অন্তর" - এটি দিয়ে মুনাফিকদের অন্তরকে নির্দেশ করা হয়েছে, যেমনটা মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ

"এ কি হলো তোমাদের! তোমরা মুনাফিকদের ব্যাপারে দুই দল হয়ে গেলে ? (বিশেষ করে) যখন স্বয়ং আল্লাহই তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের উপর অভিশাপ নাযিল করেছেন।" (সূরা নিসা, ৪ : ৮৮)

অর্থাৎ, তাদের প্রতারণাপূর্ণ কাজের কারনে আল্লাহ তাদেরকে পুনরায় অধঃপতিত করে দিয়েছেন আর যে মিথ্যায় তারা অভ্যস্ত ছিল সেটির দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এটিই হল সবচেয়ে মন্দ ও জঘন্য অন্তর, কারন এটি মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যারা এর অনুসরণ করে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও বশ্যতা প্রদর্শন করে। এই অন্তর সত্যকে মিথ্যা বলেও বিশ্বাস করে এবং যারা এর অনুসরণ করে তাদের প্রতি শত্রুতা প্রদর্শন করে। (এমন অন্তর থেকে) আল্লাহ'র নিকট আশ্রয় চাই।

"এমন অন্তর যেটির দুটো তাড়না রয়েছে" - এটি দিয়ে নির্দেশ করা হয়েছে সেই অন্তরকে, যেটিতে ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় নি, কারন এটি নিজেকে কেবলমাত্র সেই সত্যের প্রতি অনুগত করেনি - যে সত্যকে আল্লাহ তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে প্রেরণ করেছিলেন। এর পরিবর্তে এই অন্তরে রয়েছে কিছু ঈমান আর কিছু এর বিপরীত - কখনো এটি ঈমানের চেয়ে কুফরির অধিকতর নিকটে থাকে, আর অন্যান্য সময় এটি কুফরির চেয়ে ঈমানের অধিকতর নিকটে থাকে। কোন সময়ে এই অন্তর সেটির অনুসরণই করে, যেটি তার উপর সে সময়ে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী থাকে।

টীকা

(১) যেমনটি বলেছেন ইবনুল কায়্যিম।

(২) ইবনুল কায়্যিমের কিতাব - হাদিয়্যুল আরওয়াহ ইলা বিলাদিল- আফরাহ, পৃষ্ঠা ৪৫।

(৩) ইবন মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কুরআনের একটি শব্দ তিলাওয়াত করবে সে একটি সওয়াব পাবে, যা দশগুণ বৃদ্ধি করা হবে। আমি বলছি না যে 'আলিফ লাম মীম' একটা শব্দ, বরং 'আলিফ' একটা শব্দ, 'লাম' একটা শব্দ, 'মীম' একটা শব্দ।"

(রিয়াদুস সলিহিন –২/৬২, ১০৬ নং হাদিস; মিশকাত আল মাসাবিহ - ১/৪৫২; তিরমিযি – ২৯১২ এবং দারিমি। এটি সাহিহ হাদিস। আরও দেখুনঃ আস সাহিহাহ – ৬৬০; ইবনুল কায়্যিমের যাদ আল- মা'আদ এর উপর শু'আইব আল- আরনা'উত কতৃক টীকা – ১/৩৩৯) [অনুবাদকের টীকা]

(৪) বুখারি - ৬/৫০১, হাদিস নং ৫৪৫

(৫) রিয়াদুস সলিহিন কিতাবের "কুরআন তিলাওয়াতের ফজিলত" অধ্যায়টিও দেখুন।

একটি হাদিস আবু উমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছেন, "তোমরা কুরআন পাঠ করো, কারন কিয়ামতের দিন সে তার পাঠকারীর জন্য শাফায়াতকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটো উজ্জ্বল সূরা অর্থাৎ সূরা বাকারা আর সূরা আলে ইমরান পড়ো, কিয়ামতের দিন এ সূরা দুটো এমনভাবে আসবে যেন তা দুখণ্ড মেঘ বা দুটো ছায়াদানকারী বা দুই ঝাঁক উড়ন্ত পাখি যা তার পাঠকারীর পক্ষ হয়ে কথা বলবে। আর তোমরা সূরা বাকারা পাঠ করো। এ সূরাটিকে গ্রহণ করা বরকতের কাজ আর পরিত্যাগ করা পরিতাপের কাজ। এবং বাতিলের অনুসারীরা এর মোকাবিলা করতে পারে না।"

আরেকটি হাদিস নাওওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেনঃ আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বলতে শুনেছি কিয়ামতের দিন কুরআন এবং কুরআন অনুযায়ী যারা আমল করতো তাদেরকে আনা হবে। সূরা বাকারা আর সূরা আলে ইমরান অগ্রভাগে থাকবে। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সূরা দুটো সম্পর্কে তিনটি উদাহারন দিয়েছিলেন যা আমি কখনো ভুলিনি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেন, "এই দুটো সূরা দুই খণ্ড ছায়াদানকারী মেঘের আকারে বা দুটো কালো চাদরের মত ছায়াদানকারী হিসেবে আসবে যার মধ্যখানে থাকে আলোর ঝলকানি অথবা সারিবদ্ধ দুই ঝাঁক পাখির আকারে আসবে এবং পাঠকারীদের পক্ষ নিয়ে যুক্তি দিতে থাকবে।" (মুসলিম – ২/৩৮৫- ৩৮৬, ১৭৫৭,১৭৫৯) [অনুবাদকের টীকা]

(৬) বুখারি – হাদিস নং ৯৪৭৪; মুসলিম – হাদিস নং ৭৫৮

(৭) নাসাঈ, তিরমিযি – ১/১২৮, তিনি বলেছেন হাদিসটি হাসান সাহিহ

(৮) ইবনে তায়মিয়্যাহ সম্পর্কে এই লেখক পরিচিতি অংশটি তৈরি করতে মূলত এই উৎসগুলো ব্যবহার করা হয়েছেঃ

যুগস্রষ্টা সংস্কারক ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ; সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (২য় খন্ড); Expounds on Islam; The lofty virtues of Ibn Taymiyyah; The essential pearls & gems of Ibn Taymiyyah

(৯) হাদিসটি ইবনে মাযাহ, তিরমিযি ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে।

(১০) হাদিসটি আবু দাউদে (কিতাবুল মালাহিম) ও মুসতাদরাকে হাকিম (৪/৩৯৬) এ বর্ণিত হয়েছে। ইমাম সুয়ূ্যতি বলেন, হাদিসের আলিমরা এতে একমত যে হাদিসটি সাহিহ।

(১১) ইবনুল কায়্যিমের ইগাসা আল লাহফান ১/৭- ১০; ইবনে তাইমিয়্যাহ'র মাজমু' ফাতওয়া ১০/৯১- ১৪৯

(১২) ইবনে আস- সা'দি'র কিতাব তারিক আল- উসুল ইলা আল- 'ইলম আল- মা'মুল বি মা'রিফাহ আল- কাওা'ইদ ওয়া আদ- দাওয়াবিত ওয়াল- উসুল (পৃষ্ঠা ২০৪)

(১৩) এই লাইনটুকু অনুবাদক (ইংলিশ- বাংলা) কতৃক যোগ করা হয়েছে মুনাফিকদের ব্যাধি সম্পর্কিত আয়াত থেকে চিকিৎসা সম্পর্কিত আয়াতগুলোর মধ্যে পার্থক্যকীকরণের উদ্দেশ্যে।

(১৪) পূর্ণ হাদিসটি জাবির বিন 'আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেনঃ আমরা একটি সফরে গেলাম আর আমাদের মধ্যে একজন ব্যক্তি তার মাথায় পাথরের আঘাতের কারনে আহত হল। এরপর তার স্বপ্নদোষ হল। তিনি তার সাথীদের জিজ্ঞেস করলেন, "আমার জন্য কি তায়াম্মুম করার অনুমতি আছে ?" তারা বললেন, "আপনি যেহেতু (পবিত্রতার জন্য) পানি ব্যবহারে সক্ষম, তাই আমরা আপনার ব্যাপারে কোন অনুমোদন দেখি না।" সুতরাং তিনি গোসল করলেন আর এর ফলে ইন্তিকাল করলেন। আমরা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে যখন ফিরে গেলাম তখন তিনি এই ঘটনা জানতে পেরে বললেন, "ওরা তাকে মেরে ফেললো, আল্লাহ তাদেরকেও মেরে ফেলুন! যদি তারা না জানে তবে কি তারা জিজ্ঞেস করবে না ? নিশ্চয়ই অজ্ঞতার চিকিৎসা হল জিজ্ঞেস করা। তার জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল, আর ক্ষতের উপর একটু পানি ছিটিয়ে দিলে বা ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে এর উপর মাসেহ আর তার অবশিষ্ট শরীর পরিস্কার করলেই হতো।"

হাদিসটি সুনানে আবু দাউদ (১/৮৯, হাদিস ৩৩৬) এবং আদ- দারুকুতনিতে বর্ণিত আছে। যদিও হাদিসটির সনদ জয়ীফ, কিন্তু এটি সুনানে ইবন মাজাহতে ইবন আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদিসের সমর্থন পায়, যা এই হাদিসকে হাসান পর্যায়ে উন্নীত করে, অবশ্য হাদিসের শেষ অংশ যা "ক্ষতের উপর একটু পানি ছিটিয়ে দিলে" থেকে শুরু হয়েছে – সেটি জয়ীফ হিসেবেই আছে। দেখুনঃ তামাম আল- মিন্নাহ (পৃষ্ঠা ১৩১), সাহিহ সুনান আবু দাউদ (হাদিস ৩৬৪), সাহিহ ইবনে মাজাহ (হাদিস ১২৬), ইবন হাজর এর তালখিস আল- হাবির (১/২৬০, নং ২০১), আল- আজিমাবাদি এর 'আওন আল- মা'বুদ (১/৫৩৪, ইবনুল কায়্যিমের টীকাসহ) [অনুবাদকের নোট]

(১৫) যেমনটি বলেছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ), যা ইবনুল কায়্যিম আল- জাওাব আল- কাফি তে উল্লেখ করেছেন।

(১৬) সাহিহ বুখারি – ৮/২৭৮, হাদিস ৪১৬

(১৭) সাহিহ বুখারি – ১/২৫৪, হাদিস ৪২৪ এবং ২/১৫৬, হাদিস ২৮০

(১৮) এটি একটি সুদীর্ঘ দুয়া'র অংশ, যা বর্ণনা করেছেন আহমাদ- ৩৭১২, আবু ইয়া'লা- ১/১৫৬, আত- তাবারানি'র আল- কাবাইর- ৩/৭৪/১ এবং আরও অনেকে। এটি সাহিহ হাদিস। দেখুন আস- সাহিহাহ এর ১৯৯ নাম্বার হাদিস। আহমাদে হাদিসটির বর্ণনাটিতে একলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে, বহুলিঙ্গ নয়। [অনুবাদকের টীকা]

(১৯) সাহিহ বুখারি - ১/৩২, হাদিস ৩৩; সাহিহ মুসলিম - ১/৪০, হাদিস ১১১

(২০) মা'রুর থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেনঃ আমি একবার রাবাবা নামক স্থানে আবু যারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তখন তার পরনে ছিল এক জোড়া কাপড় (লুঙ্গি ও চাদর) আর তার চাকরের পরনেও ছিল ঠিক একই ধরনের এক জোড়া কাপড়। আমি তাকে এর (সমতার) কারন জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, "একবার আমি এক ব্যক্তিকে গালি দিয়েছিলাম আর আমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছিলাম। তখন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, 'আবু যার, তুমি তাকে তার মা সম্পর্কে লজ্জা দিয়েছো ? তুমি এমন ব্যক্তি যার মধ্যে এখনো জাহিলী যুগের স্বভাব রয়েছে। জেনে রেখো, তোমাদের দাসেরা তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। তাই যার ভাই তার অধীনে থাকবে, তাকে যেন সে নিজে যা খায় তাকেও তা- ই খাওয়ায় আর নিজে যা পরে তাকেও তা- ই পরায়। তাদের উপর এমন কাজ চাপিয়ে দিও না যা তাদের জন্য খুব বেশী কষ্টকর। যদি এমন কষ্টকর কাজ করতে চাও, তাহলে তোমরাও তাদের সে কাজে সাহায্য করবে।' " (সাহিহ বুখারি - ১/২৯, হাদিস ২৯) [অনুবাদকের টীকা]

(২১) সাহিহ মুসলিম - ২/৪৪৪, হাদিস ২০৩৩

(২২) সাহিহ বুখারি - ৯/৩১৪, হাদিস ৪২২; সাহিহ মুসলিম - ৪/১৪০২, হাদিস ৬৪৪৮, আহমাদ - ২/৪৫০

(২৩) ইবন তাইমিয়্যাহ'র ইকতিদা সিরাতুল মুস্তাকিম

(২৪) আল- বুখারি ও মুসলিম কতৃক বর্ণিত

(২৫) সাহিহ বুখারি - ৮/৮৯, হাদিস ১৩৯; সাহিহ মুসলিম - ১/২৭, হাদিস ৫৭

(২৬) তিরমিযি কতৃক বর্ণিত, এছাড়াও এটি আল- বাগাওি তার শারহ আস- সুন্নাহ ১২/৩৬৬ তে বর্ণনা করেছেন, হাকিম একে সাহিহ এবং আল- 'ইরাকি একে হাসান বলেছেন।

(২৭) সাহিহ বুখারি - ৮/২১৭; সাহিহ মুসলিম - ৪/১৪২২, হাদিস ৬৫৪৯; সুনান আবু দাউদ - ৩/১৪০২, হাদিস ৫০৩১

(২৮) তিরমিযি - ৩৪০১; হাদিসটি সাহিহ, দেখুনঃ শাইখ 'আলী হাসানের মুহাযযাব 'আমাল আল- ইয়াওম ওয়া লাইলা পৃষ্ঠা ৩৩ [অনুবাদকের টীকা]

(২৯) সাহিহ মুসলিম - ৪/১৪২২, হাদিস ৬৫৫০

(৩০) সাহিহ বুখারি - ৮/২১৭, হাদিস ৩২৪; সাহিহ মুসলিম - ৪/১৪২২, হাদিস ৬৫৪৯

(৩১) গুতবাঃ এর অর্থ হল হিংসা, এটি দ্বারা নির্দেশ করে হিংসা'র অনুমোদিত রূপকে। এটি হিংসার এমন একটি রূপ, যেখানে হিংসুক ব্যক্তি যে ব্যক্তির ব্যাপারে হিংসা করা হয়, সেই ব্যক্তির কাছে থাকা একই অনুগ্রহ কামনা করে সেই

ব্যক্তি থেকে অনুগ্রহগুলো অপসারণের কামনা রাখা ছাড়াই। গুতবা হল হাসাদের বিপরীত, হাসাদ হল হিংসার নিন্দনীয় রূপ যেখানে হিংসুক ব্যক্তি যে ব্যক্তি ব্যাপারে হিংসা করে তার থেকে অনুগ্রহ অপসারণ কামনা করে।

(৩২) সাহিহ বুখারি - ১/৬২, হাদিস ৭৩; সাহিহ মুসলিম - ২/৩৮৯, হাদিস ১৭৭৯

(৩৩) সাহিহ বুখারি - ৬/৫০০, হাদিস ৫৪৩; সাহিহ মুসলিম - ২/৩৮৮, হাদিস ১৭৭৭

(৩৪) সাহিহ বুখারি - ৬/৫০১, হাদিস ৫৪৪

(৩৫) বুখারি ও মুসলিমে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে

(৩৬) সাহিহ বুখারি ও সাহিহ মুসলিমে এর বর্ণনা রয়েছে।

(৩৭) যেমনটি বর্ণনা করেছেন আল- বুখারি, মুসলিম আর আহমাদ।

(৩৮) অথবা যাদের ইলম রয়েছে, এ কারনেই হাদিসের আলিমরা সেই সব আলিমদের বর্ণনা গ্রহণ করেন না যারা তাদের সমসাময়িক আলিম কতৃক সমালোচিত।

(৩৯) এই বর্ণনাটি জয়ীফ যা হাসান আল- বাসরি থেকে মুরসাল বর্ণনায় আবু আশ- শাইখ আর তাবারানি বর্ণনা করেছেন।

(৪০) মুসনাদে আহমাদ (১৪১২, ১৪৩০) এবং তিরমিযি (২৫১২) তে এটি বর্ণিত হয়েছে। এর ইসনাদে অপরিচিত রাবি রয়েছে, কিন্তু হাদিসের সাক্ষী আছে, এটি আবু আদ- দারদা আর আবু- হুরাইরা বর্ণনা করেছেন যা হাদিসটিকে জোরদার করেছে। মাজমা’ আয- যাওাইদ (১০/৮) এ লেখক এই হাদিসটি আল- বাজ্জারের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আল- মুনযিরি বলেছেন যে এর ইসনাদ ভালো।

(৪১) তিরমিযি, তাবারানি, মুসতাদরাক হাকিম; - তারা বলেছেন যে হাদিসটি সহিহ

(৪২) হাদিসটি ইমাম আহমাদ, হাকিম এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি সহিহ। দেখুনঃ সাহিহ আল- জামি’ (৭১০৪) এবং আত- তাহাওি’র শারহ মুসকিল আল- আসারের উপর শু’আইব আল- আরনা’উতের টীকা।

(৪৩) সাহিহ বুখারি - ৮/৫৮, হাদিস ৯১; সাহিহ মুসলিম - ৪/১৩৬০, হাদিস ৬২০৫, ৬২১০

(৪৪) সাহিহ বুখারি - ১/১৯, হাদিস ১২; সাহিহ মুসলিম - ১/৩১, হাদিস ৭২, ৭৩

(৪৫) সাহিহ বুখারি - ৮/২৬, হাদিস ৪০; সাহিহ মুসলিম - ৪/১৩৬৮, হাদিস ৬২৫৮

(৪৬) সাহিহ বুখারি - ৮/৩৪, হাদিস ৫৫; সাহিহ মুসলিম - ৪/১৩৬৮, হাদিস ৬২৫৭

(৪৭) এখানে ইবনে তাইমিয়্যাহ’র একটি ভুল হয়েছে, এই পূর্ণ হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে ইবনে মাজাহতে (৪২১০), আবু দাউদে বর্ণনাটির কেবল প্রথম বাক্যটি রয়েছে আর এই হাদিসটির ইসনাদে অপরিচিত রাবি রয়েছে।

(৪৮) এটিও ইবনে তাইমিয়্যাহ’র আর একটি ভুল, হাদিসটি বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়নি, বরং এটি আবু দাউদ (২/৪৪৫, হাদিস ১৬৯৪) আর মুসতাদরাক হাকিমে (১/১১) বর্ণিত হয়েছে, এর ইসনাদ সাহিহ।

(৪৯) সংরক্ষিত উৎস থেকে আমি যতদূর জানি, ইনি ছিলেন সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস।

(৫০) অনুরূপ একটি হাদিস আল- বায়হাকী বর্ণনা করেছেন এবং এটি একটি যয়ীফ হাদিস (ফায়দ আল- কাদির)

(৫১) ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ একজন সম্মানিত তাবীঈ, কিন্তু তার থেকে বর্ণিত এই হাদিস সরাসরি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ' লাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে (অর্থাৎ, রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এবং এই তাবীঈ' র বর্ণনার মধ্যে কোন সাহাবী কতৃক এর বর্ণনা পাওয়া যায় নি) আর এটি নির্ভরযোগ্য নয়।

(৫২) এটি একটি যয়ীফ হাদিস। এর অনির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে ইবনুল কায়্যিমের আল- জাওাব আল- কাফি ও রাওদাহ আল- মুহিব্বিন কিতাবে এবং আল- আলবানীর সিসিলাহ আয- যয়ীফ কিতাবে আলোচনা রয়েছে।

(৫৩) আল- বুখারি ও মুসলিম কতৃক বর্ণিত।

(৫৪) ইবনুল কায়্যিমের রাওদাহ আল- মুহিব্বিন কিতাবে এর উল্লেখ আছে, এ সম্পর্কে তার চমৎকার এক আলোচনা আছে।

(৫৫) আল্লাহ যে সময়গুলোতে দুয়ার জবাব দেন এগুলো সে সময়গুলো, এগুলো সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য হাদিস রয়েছে।

(৫৬) আল- বুখারি ও মুসলিম কতৃক বর্ণিত আবু মুসা আল- আশ'আরি থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "এ দুয়া হল জান্নাতের রত্ন ভাণ্ডারসমূহের অন্যতম।"

(৫৭) মুসলিম

(৫৮) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আহমাদ ও আত- তিরমিযি কতৃক বর্ণিত একটি হাসান হাদিসে এর উল্লেখ রয়েছে।

(৫৯) ইমাম ইবনুল কায়্যিম, দারুসসালাম পাবলিকেশন্স; সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস, (আবুল হাসান আলী নদভী);

http://www.sahihalbukhari.com/SPS/sp.cfm?subsecID=SRH06&articleID=SRH060001&articlePages=1 ;

http://www.islamicity.org/7752/short-biography-of-ibn-al-qayyim-al-jawziyya/

(৬০) এই প্রবন্ধটি নেওয়া হয়েছে ইবনুল কায়্যিমের ইগাসাতুল লাহফান ফি মাসাইদ আশ- শাইতান (১/১১- ১৯) থেকে।

(৬১) সাহিহ মুসলিম (২৬৭)

(৬২) আল- ঈমান (পৃষ্ঠা ১৭), আবি শাইবাহ এবং অন্যান্যরা এটি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন।